KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M T AMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200	Place of Publication: 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLG	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন	Size : 7"x 9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ২১/-	Year of Publication : পৌষ ১৩৮০ ॥ January 1974
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

একবিংশ বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৮০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কলকাতা কালে কালে

কলকাতা একদিনে হয়নি। কালে কালে বদলেছে। মহানগরী হয়ে ওঠার পথে তাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি, অনেক দুর্বিপাক। ১৭০০ সালের কথাই ধরা যাক। সেদিনের কলকাতায় না ছিল কলের জল, না গ্যাসের বাতি, না পাকা বাড়ি, না রাজপথ। যানবাহন বলতে একটিই। পাল্কি। বিদ্যুতের আলো কিংবা কলে-চলা গাড়ি কলকাতাবাসীর কাছে ছিল স্বপ্নেরও অতীত।
আজকের কলকাতায় ভূগর্ভ-রেল কিন্তু আর স্বপ্ন নয়। একটি বাস্তব পরিকল্পনা। কলকাতার বিপুল জনসংখ্যা, সীমিত আয়তন, অপরিসর পথ এবং যানবাহনের সংখ্যাল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে ভূগর্ভ-রেলের প্রয়োজনীয়তা আজ একান্তভাবেই জরুরী। কিন্তু এই বিশাল পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দেবার পথে সবার আগে প্রয়োজন কলকাতার মানুষের সহৃদয় সহযোগিতা।

কলকাতা একদিনে হয়নি

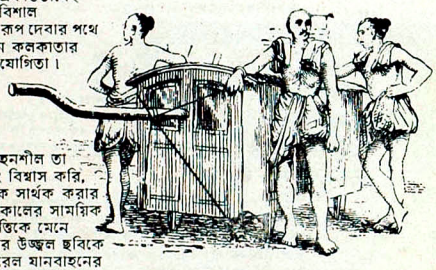

কলকাতার মানুষ সহনশীল তা আমরা জানি। এবং বিশ্বাস করি, এই বিপুল কর্মযজ্ঞকে সার্থক করার প্রচেষ্টায় তাঁরা কিছুকালের সাময়িক দুর্ভোগ ও বাধা-বিপত্তিকে মেনে নেবেন আগামীকালের উজ্জ্বল ছবিকে মনে রেখে। ভূগর্ভ-রেল যানবাহনের তালিকায় শুধু একটা নতুন নাম নয়, কলকাতার নতুন মানচিত্র গড়ে তোলার এক সুবৃহৎ উদ্যোগ।

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল

MTP মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

medium

একবিংশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা ৯ পৌষ তেরশ' আশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা ॥ নবেন্দু সেন ৪১৩

লোকচিত্রের ভাষা ॥ অজিতকুমার মিত্র ৪২৩

মলিয়ের ও বাংলা নাটক ॥ জগন্নাথ ঘোষ ৪২৭

রামকৃষ্ণ কাব্যের উপেক্ষিত ॥ হরতোষ চক্রবর্তী ৪৩২

তুর্কমেনিয়া সাথে ভারতের সুপ্রাচীন সম্পর্ক ॥ সুধীন্দ্র কুমার ৪৩৬

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে : রুচি বিচার ॥ রবি মিত্র ৪৪০

আলোচনা : পট ॥ রবি মিত্র ৪৪২

দেশ পরিচয় ॥ সন্তোষকুমার বসু ৪৪৪

সমালোচনা : মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ ॥ অধীর দে ৪৪৬

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

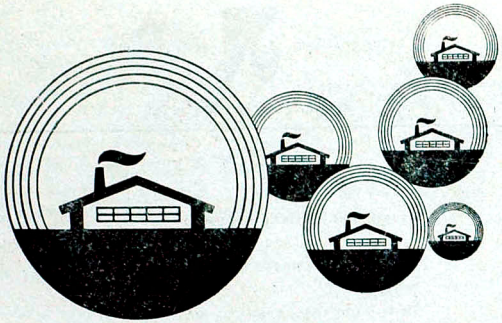

Making new industries bloom

Thirty years ago, manufacturing cars in India appeared to many like an idle dream. But Hindustan Motors ventured into this new field.

India is now self-sufficient in automobiles largely because of the pioneering efforts of Hindustan Motors. What is equally important, Hindustan Motors have helped to bring into existence a host of new ancillary industries employing tens of thousands of skilled technicians to manufacture the hundreds of components that go into the making of an automobile.

Over the past thirty years, these industries, brought into being by Hindustan Motors, have expanded, diversified and improved their range of manufactures to meet the demands of other automobile manufacturers not only in India but also abroad. Today one of the important items of export of the Indian Engineering industry are automobile components and accessories which bring in more than Rs. 15 crores in foreign exchange every year.

Bringing new ancillary industries into existence—this is one of the ways in which Hindustan Motors keep India's economy moving and growing.

Hindustan Motors Limited
Keeping India's economy moving and growing

CC/HMS-1/72

পৌষ
তেরশ' আশী

সমকালীন

একবিংশ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা

নবেন্দু সেন

উনিশ শতকের মহত্তম মানুষ রামমোহন ; কিন্তু বুদ্ধিজীবি মহলের অন্যতম প্রধান ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। কেবল ধর্ম বোধে নয়, সামাজিক অন্যান্য সংস্কার ও উন্নতির ক্ষেত্রেও তিনি পুরোপুরি প্রগতিবাদী ছিলেন। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক ভাবনা চিন্তার আলোচনা থেকে এই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। অবশ্য ঐতিহাসিক দিক থেকে রামমোহনই প্রথম আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে সমকালীন কর্তৃপক্ষকে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন। লর্ড আমহার্ষ্টকে লেখা রামমোহনের সেই অতি বিখ্যাত এবং বহুল কথিত চিঠিটির অংশ বিশেষে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

'In the same manner the sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the govt, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of education, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry, Astronomy with other useful sciences.……'

রামমোহনের এই উক্তির কাল ১৮২৩। অর্থাৎ ইতিমধ্যে ফোর্টউইলিয়ম কলেজ পুরোনো হয়ে গেছে ; হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; স্কুলবুক সোসাইটি (১৮১৭) ও ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটিও (১৮১৮) ততদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'ও (১৮১৫) ততদিনে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি ক'রেছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় ফোর্টউইলিয়ম কলেজের (১৮০০) কর্তৃপক্ষরা কেউ কিন্তু এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তেমন উৎসাহ দেখান নি। যদিও

ফোর্টউইলিয়ম কলেজই ভারতের প্রথম পাশ্চাত্যরীতির একটি বৃহৎ শিক্ষায়তন। কেবল শিক্ষায়তন নয় এটিই প্রথম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, 'Indian oxford' ছিল। গিলক্রাইষ্ট, এডমনস্টোন, জি. এইচ. বার্লো, জে. এইচ, হারিংটন, ডবলু, কার্ক প্যাট্রিক, উইলিয়ম কেরী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন; কিন্তু কেউই ভারতের জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্বন্ধে পৃথকভাবে অথবা একত্রে কোন পরিকল্পনা করেন নি। অবশ্য ফোর্টউইলিয়ম কলেজ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ ও স্বতন্ত্র ছিল। এঁদের নিকট থেকে ঠিক রামমোহন, বিদ্যাসাগরের চিন্তার মত কোন চিন্তা আশা করাও বোধ হয় সঙ্গত নয়; কিন্তু লর্ড ওয়েলিসলী এবং উইলিয়ম কেরী, টমাস বা মার্শমানের মত উদার মানসিকতার লোকেদের প্রেরণায় যদি এ ধরণের কোন জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা গৃহীত হতে পারত তাহলে কোন বিস্ময় সৃষ্টি হত না। বোধহয় সেটা বাঞ্ছিত ও হত।

যাই হোক, রামমোহনের পরে বিদ্যাসাগরের হাতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল, আমরা জানি। অবশ্য যে আক্ষেপ ফোর্টউইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের আছে তা এই সময়ে অন্যান্য ইয়োরোপীয় উদার চিত্ত ব্যক্তিদের উৎসাহ, উদ্দীপনায়, কাজে, কর্মে সহযোগিতার মাধ্যমে বহুলাংশে মিটে যায়। জে, এফ ময়াট, রেভারেন্ড লঙ, বেথুন সাহেব, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি ভারত বন্ধুদের সহায়তায় বিদ্যাসাগরের মত উদ্যমী ও তেজস্বী পণ্ডিতের পক্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছিল; তাতে সন্দেহ নেই। Organaisational সফলতা রামমোহন অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের বেশী এসেছিল প্রধানত এই সহযোগিতার জন্যে; অবশ্য ততদিনে সমাজের Intelligentia'র ও প্রতিষ্ঠা ভাল হয়েছিল। Ladies Society (1824), Calcutta Ladies association for native female Education'র (1825) পরে তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), Anglo Indian Hindu Associatoin (1830), জ্ঞান সন্দীপন সভা (১৮৩০), সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮) সমিতিগুলি তখন রীতিমত জাগ্রত। বস্তুত ১৮২৮-১৮৪০'র মধ্যে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিরা নানা স্থানে সচেতনভাবে তখন নানা সভা সমিতির মাধ্যমে একটি সামাজিক বুদ্ধির দিগন্ত সৃষ্টি করেছিলেন। হয়ত এই চাঞ্চল্যের মধ্যে অনেকটাই হুজুগপ্রিয়তা ছিল। হয়ত উৎসাহের সঙ্গে উৎচ্ছৃঙ্খলতা ছিল অনেক বেশী—Indeed the spirit of discussion became a perfect mania ; and its manifestation, both in freqnency and variety, was carried to a prodijious excess.'[১]

এ কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার যে স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের সুযোগ ডিরোজিও হিন্দু কলেজে প্রবর্তিত করে গিয়েছিলেন তার শক্তি এই সমস্ত সভাসমিতিগুলিতেও বাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এবং ডাফ্ সাহেব ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন—'But the most striking feature in the whole was the freedom with which all the subjects were discussed.' এই পরিবেশে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর অনেক পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে কাজ করার সময় শিক্ষা বিষয়ক বড় বড় কতকগুলি কাজ করতে পেরেছিলেন।[২] যেমন: ১। জাতি নির্বিশেষে সকল ছাত্রের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

২। এই শিক্ষালাভের জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সংস্কৃত কলেজে ভর্তির অধিকার পেল

৩। ছাত্র বেতন প্রবর্তিত হল।

৪। উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ-কৌমুদী, ঋজুপাঠ, প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তক রচনা করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতের জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম করা হল।

৫। সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করে সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদনের ব্যবস্থা করা হল।

৬। ২ মাস গ্রীষ্মাবকাশ প্রবর্তন।

৭। সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজী ভাষা চর্চার ব্যবস্থা।

৮। গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

৯। মডেল স্কুল স্থাপন।

১৮৪৯-এ বেথুন কর্তৃক প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলে বিদ্যাসাগর সেই স্কুলের সম্পাদক হয়েছিলেন।[৩] ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্যে বেথুনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নাম ও একত্রে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইংরেজ সরকার এ দেশীয়দের শিক্ষিত করে তুলতে চান নি। শাসন কর্ম চালানোর জন্যে যতটুকু না হলে নয় ততটুকু পড়াশুনোর কাজ চালানোর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। ফলতঃ দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজন নিয়ে বেথুন ও বিদ্যাসাগর যখন কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিলেন কর্তৃস্থানীয়দের বিরাগভাজন হন এবং ১৮৫৮'র স্কুল পরিদর্শকের সরকারী চাকরিতে ইস্তাফা দিয়েছিলেন। শিক্ষা বিভাগের সেকালীন ডিরেক্টর মিষ্টার গর্ডন ইয়ং'র সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার নিয়ে বিদ্যাসাগরের মনান্তরও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দেশে স্ত্রী শিক্ষা আটকে রাখা সম্ভব হয় নি। নতুন স্ত্রী শিক্ষায় আলোকিত সমাজের চেহারারও বদল লক্ষিত হল।

'এখন ছুঁড়ি গুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে সবে,
এখন এ, বি, শিখে বিবি সেজে
বিলিতি বোল কবেই কবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে
আর কী তাদের তেমন পাবে?'[৪]

অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের সমবয়সী ছিলেন (১৮২০)। যে সামাজিক পরিবেশে উভয়ের মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তারও বিস্তৃত পরিচয় জানা আবশ্যক। অক্ষয় দত্তও কলকাতার সমাজ-জীবনে প্রবেশ করেন তাঁর বছর দশেক বয়সে। অর্থাৎ ১৮৩০-এ। ১৮৩০ থেকে ১৮৫০।৫৫'র মধ্যে উভয়ের কর্ম ও সৃষ্টিশীলতার পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অক্ষয়কুমারের ভাবনা চিন্তার সঠিক মূল্য-বিচার করা হল না। দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর ওদিকে মধুসূদন ও রাজনারায়ণ বসুর প্রখর ব্যক্তিত্বের নিকট জ্ঞাননিষ্ঠ, সাধক বুদ্ধিজীবি অক্ষয়কুমারের নিভৃত কর্মসাধনা উচ্চরবে জাহির করা হয় নি। অথচ এই জ্ঞান তাপসের কর্মময় জীবনের বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব কারো অপেক্ষা কম ছিল না। স্বল্পকালের ব্যবধানে ইনিই প্রথম রামমোহন রায়ের জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন; নীলচাষ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী মতামত প্রকাশ করেছিলেন, বেদের অভ্রান্তবাদ সম্বন্ধে বাস্তবযুক্তি প্রয়োগ করে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন এনেছিলেন। আবার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের

সামাজিক পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপস্থিত করেই কেবল নিজের জ্ঞান মণীষার পরিচয় দেন নি চারুপাঠের মত popular science'র বই লিখে শিক্ষার জগতে প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন, উপকার করেছিলেন একাদ্রিক্রমে বারোবৎসর (১৮৪৩—১৮৫৫) ধরে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাটি সম্পাদনা করে। ১৮২৮—৩০'র Intelligentia আন্দোলনের চাঞ্চল্য স্থিত হওয়ার পরে বিদ্বৎসমাজের আসল গুণটি ধরা পড়েছিল যে সমস্ত ব্যক্তি, সংগঠন ও পত্র পত্রিকার মাধ্যমে তার মধ্যে অক্ষয় দত্তের ব্যক্তিত্ব ও তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের ছেলেমেয়েরা মিশনারী স্কুল ছাড়াও স্বদেশী স্কুলে যাতে নিরাপদে পড়াশুনো করতে পারে তার জন্যে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করতেও তিনি সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু নিজেও যে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কত গভীর ভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং এত দীর্ঘকাল পরেও তার মূল্য সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনালোচিত দিক বলে বিচার্য। অক্ষয় দত্তের শিক্ষা-চিন্তার পরিচয় প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি তথ্য পটভূমি হিসাবে জানা উচিত। যেমন রক্ষণশীল দলের নেতা রাধাকান্ত দেবও স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন এবং তিনি গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক রচনা লিখতে (১৮২২) সাহায্যও করেছিলেন। এর পূর্বে ১৮১৯-এ The Female Juvenile Society প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ('গৌর বাড়ীতে' প্রথম এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল)। ১৮৩২-এ সোসাইটির সংখ্যা বেড়ে গিয়ে Calcutta Baptist Female School Society নামে প্রচলিত হয়। চার্চ মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেও বেশ কিছু সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ সময়। মেরী মানকুক এঁদের মধ্যে এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী কর্মী ছিলেন। বেথুনের স্কুলটিও এতদিনে বেশ নাম করেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কন্যা সৌদামিনী ঠাকুরকে এই স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল।৬

১৮৫১'র সৌদামিনীকে ভর্তি করা হয়েছিল। ১৮৫০-এ বিদ্যাসাগর এই স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন; ১৮৫৪'র Court এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি 'সূত্র' প্রয়োগ করেন। ১৮৫৭'র ছোটলাট ফ্রেডারিক হ্যালিডে এই সূত্র অনুযায়ী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন; এবং বিদ্যাসাগরকে Model girls school স্থাপন করতে অনুরোধ জানান।

এই সময়ের মধ্যে (১৮৫৭) অক্ষয় দত্তের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন তাঁর 'ভূগোল' (১৮৪১), 'ডেভিড সাহেবের···বক্তৃতা' (১৮৪৫), বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ ভাগ ১৮৫১, ২ ভাগ ১৮৫৩), চারু পাঠ (১ ভাগ ১৮৫৩, ২ ভাগ ১৮৫৪), বাষ্পীয়র আরোহী (১৮৫৫), ধর্মোন্নতি সংশোধন বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), ধর্মনীতি (১৮৫৬) এবং পদার্থ বিদ্যা (১৮৫৬)।

১৮৪৩'র জুন মাসে দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায়' ভূগোল ও 'পদার্থবিদ্যা'র শিক্ষক রূপে অক্ষয়কুমার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। স্কুলের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে অক্ষয়কুমার বক্তৃতা করেছিলেন, ইংরেজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খৃষ্টীয় ধর্মকে পৈতৃক ধর্মরূপে গ্রহণ—এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিবারণ করা, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া বিনা বেতনে

ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষা প্রদান করা'র নিমিত্ত তত্ত্ব বোধিনী সভা অদ্য ১২৬৫ সালের বৈশাখ রবিবার এতৎ পাঠশালা-রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।'৭

১৮৪১-এ প্রকাশিত তাঁর 'ভূগোল' বইয়ের ভূমিকাতেও লিখেছিলেন,—'ইদানীং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্যোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্দ্বারা বালক দিগকে সুচারুরূপে শিক্ষাপ্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এই অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্রস্তধালোভী উদ্বাহু বামুনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া, বহু ক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল প্রস্তুত করিয়াছি।'৮

এই দুটি মন্তব্য থেকে অক্ষয়কুমারের শিক্ষানুরাগ এবং শিক্ষা চিন্তা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। বাংলা তথা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক বলে তিনিও বিশ্বাস করতেন। তাঁর পদার্থ-বিদ্যা, 'চারুপাঠ' এবং 'ভূগোল' বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরূপে পড়ানো হত। এই গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু বিচার করলে দেখা যাবে অক্ষয়কুমার বিজ্ঞানকে বাংলাভাষার মাধ্যমে বালক বালিকাদের সহজ, বোধগম্য ক'রে শিক্ষার বিষয়রূপে উপস্থিত করেছিলেন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রভূত প্রশংসার যোগ্য ছিল। কারণ বিষয়বস্তুই কেবল এদেশে নতুন ছিল না, তার প্রকাশ মাধ্যমটিও সদ্য প্রসূত ছিল। গদ্যের বয়স তখনো ৫০ বৎসর পূর্ণ হয়নি। তাতে বৈজ্ঞানিক গদ্য সৃষ্টি এক কঠিন সাধনা সাপেক্ষ বিষয় ছিল। অক্ষয় দত্তের হাতে সেই সাধনার সিদ্ধিই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আসল বিস্ময় অন্যত্র। 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) গ্রন্থের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষয়কুমারের শিক্ষা বিষয়ক যে গভীর ভাবনা চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে বিস্ময় সেখানে। এই চিন্তাধারাকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে আলোচনা করা সম্ভব। প্রথমত সাধারণভাবে শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের যে পরিকল্পনা ছিল, তাই। দ্বিতীয়ত স্ত্রী শিক্ষা এবং তৃতীয়ত শিক্ষা, সাহিত্য ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা।

অক্ষয়কুমার আমাদের জীবনের সঙ্গে শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী।

'সকলের সকল বিষয়ে সমানরূপ পারদর্শী হওয়া সম্ভাবিত নহে, এবং নিতান্ত আবশ্যকও নয়। কিন্তু সেই সমুদায় স্থূলরূপে শিক্ষা করা অপর সাধারণ সকলেরই উচিত, এবং যাহার যে যে বিষয়ে সমধিক শক্তি ও অপেক্ষাকৃত অধিক অভিরুচি আছে, তাঁদের সেই সেই বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করা কর্তব্য।'৯

সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষাদানের স্বাধীনতা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে থাকা যে নিতান্ত উচিত; একথা উন্নত প্রত্যেকটি দেশের সরকারই এখন স্বীকার করেন এবং সেই মত জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা গঠন করেন। কিন্তু আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে বিদেশী শাসকের অধীনে থেকেও অক্ষয়কুমার দত্ত সেই প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস অকপটে ব্যক্ত করেছিলেন। অক্ষয়কুমারের

বিশ্বাসের মূল্য আজকের সমাজজীবনেও কম নয়। যে কারিগরী বিদ্যা বুনিয়াদী শিক্ষা এবং job oriented educetion'র কথা এখন আমরা বলি তার পরিপ্রেক্ষিতে অক্ষয়কুমারের এই শিক্ষাপদ্ধতির গুরুত্ব নতুন করে বিবেচনা করার সুযোগ অবশ্যই আছে বলে মনে করি।

সভ্য মানুষের জীবনে শিক্ষা বিষয়টির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। সঠিক শিক্ষার মাধ্যমেই একটি জাতির সর্ব প্রকার উন্নতি ঘটে। অক্ষয়কুমার এই কঠিন বিষয়টি সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 'শিক্ষাদান যেমন গুরুতর বিষয়, তাহা সম্পন্ন করা তদনুরূপ কঠিন কার্য।' এই 'গুরুতর বিষয়টি'র আরম্ভ সম্বন্ধে তাঁর দ্বিমত বা দ্বিধা ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন 'সুকুমার ক্রোড়ই যথার্থ বিদ্যাস্থান।' শৈশবে বিদ্যারম্ভ হবে। শিশুর ২ বৎসর বয়সেই এই কঠিন কাজের সূত্রপাত হবে। কিন্তু বিদ্যালয় তখন শিশুর ক্রীড়াস্থল। অক্ষয়কুমার তাই শিক্ষাদানের জন্যে তিনটি স্তরের কথা প্রথমে বলেছেন।

১। শিশুর দুই থেকে ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত একটি স্তর।
২। বালকের চোদ্দ | পোনের থেকে কুড়ি | বাইশ বৎসর পর্যন্ত আর একটি স্তর।
৩। তৃতীয় স্তরের আরম্ভ কুড়ি | বাইশ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের নিয়ে।

প্রথম স্তরের শিক্ষার পরিবেশ সম্বন্ধে দশটি মূল্যবান ইঙ্গিত দিয়েছেন। যথা—

(ক) 'পাঠ গৃহ প্রশস্ত' ও 'পরিশ্রুত' হবে।
(খ) 'পুষ্প শোভিত' ক্রীড়া ব্যবস্থা সমন্বিত বিদ্যালয় বাঞ্ছনীয়।
(গ) শিশু | বালক, বালিকাদের সঙ্গে 'সুমিষ্ট ব্যবহার' করতে হবে।
(ঘ) অঙ্গ-সঞ্চালন সম্ভব এরূপ ব্যায়মাদির চর্চা করা।
(ঙ) শুনিয়ে, দেখিয়ে নানা কথোপকথনের মাধ্যমে পারস্পরিক ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
(চ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা।
(ছ) কীট পতঙ্গাদি ধরে শিশুরা যেন না খেলাধুলা করে।
(জ) শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি সুকুমার মানবিক প্রবৃত্তিগুলি জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা করা
(ঝ) ভূত, প্রেতের ভয় না দেখানো উচিত।
(ঞ) শারীরিক শক্তি সাধনের ব্যবস্থা করা।

এই বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে এই স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু শিক্ষার্থীদের কৌতূহল চরিতার্থ করাই মুখ্য কর্তব্য বলে অক্ষয়কুমার মনে করেছেন। এই সুপারিশগুলির মূল্য বিচার করলে দেখা যাবে এখনকার কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের যে ব্যবস্থাদি আছে তার চেয়েও উন্নততর শিক্ষার পরিবেশের উপরেই অক্ষয়কুমার গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশী। যেখানে শিশু প্রথম তার জ্ঞানলোকে উদ্ভাসিত হতে যাবে সেখানে আলোর ব্যবস্থাদি প্রথম বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে, অপরিচ্ছন্ন গৃহে শিক্ষা সম্পন্ন হয় না। যে পরিবেশে মন উন্মুক্ত না হতে পারে। যেখানে শিশুর অপার কৌতূহল চরিতার্থ না হয় সেখানে তার শিক্ষারম্ভ না হওয়াই উচিত। পাঠগৃহ প্রশস্ত হবে; 'পরিশ্রুত' হবে। 'পুষ্প শোভিত' হবে। যেখানে সুস্থভাবে ছুটাছুটি করে খেলাধুলার মাধ্যমে আচার

আচরণ শিখতে পারে এই বয়সের শিশু শিক্ষার্থীরা তারই প্রতি নজর দিতে বলেছেন অক্ষয়কুমার। লক্ষ্য করার বিষয় এই স্তরের শিশুদের জন্যে পাঠঃক্রমের কোন সুপারিশ নেই Naturalway তে যতটা সম্ভব শিশুকে বাড়তে দেওয়ার চেষ্টাই এই পদ্ধতিতে রয়েছে। Audiovisual Education'র সুপারিশ অক্ষয়কুমার করেছেন। বলাবাহুল্য এইসব পদ্ধতি এখনো নতুন। অথচ উনবিংশ শতকের মধ্যাহ্নে ব'সে অক্ষয়কুমার কত গভীর ভাবে এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করে গেছেন। শিক্ষার জগতে বেথুন, ডাফ, হেয়ার সাহেব, সটক্লিফ, মিল, এণ্ডরুজ, বিদ্যাসাগর, প্রভৃতির নাম আমরা করি; কিন্তু অক্ষয় দত্তের কথা কেউ বলেন না! অথচ কেবল উল্লেখ নয় যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। অক্ষয়কুমারের ভাবনা চিন্তায় সঠিক পরিচয় এবং তার মূল্য বিচারের আবশ্যকতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। বাংলার বিদ্বৎ সমাজের পরিচয় প্রসঙ্গেও এর গুরুত্ব সমধিক। যাই হোক দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় অক্ষয়কুমার পূর্ববৎ খোলামেলা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের কথাই বলেছেন। 'চিত্তরঞ্জনে'র সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের প্রতি যাতে শিক্ষার্থীদের 'অনুরাগ' জন্মায় শিক্ষাদানের সময় তার প্রতি নজর রাখা উচিত মনে করেছেন। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যে পাঠঃক্রমেরও উল্লেখ করেছেন।

নীতিসার (moral lesson)
পদার্থ বিদ্যা (physics)
বিজ্ঞান শাস্ত্র (general science)
পরীক্ষাগার (Laboratory work)
উদ্ভিদ বিদ্যা (Botany) (সচিত্র পাঠ)
চিত্র সংগ্রহ (collection of illustration)
রাজকার্যাদি (politics ?)

দেখা যাচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ও থিওরেটিকাল উভয় দিক থেকেই বিজ্ঞান চর্চার উপর এই স্তরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেবল বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেই এই স্তরের পড়াশুনা সীমাবদ্ধ থাকবে কিনা সেটা এখনকার শিক্ষা প্রণালীর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে বিচার্য; এবং হয়ত এই সুপারিশ এখন গ্রাহ্যও নয়। তথাপি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চর্চার আবশ্যকতা সম্পর্কে এখনো দ্বিমত নেই। একটা বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল প্রভৃতিও বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পাঠ্য বলে হয়ত এখনকার শিক্ষাবিদরা সুপারিশ করেন। অক্ষয়কুমার সেক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় স্তরেই 'চিকিৎসা বিদ্যা, গৃহ নির্মাণ, পোত নির্মাণ, যন্ত্র নির্মাণ' শিক্ষা চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন।[10]

তৃতীয় স্তরে যখন 'মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি দিন দিন পরিপক্ব হইতে থাকে' তখন উল্লিখিত বিষয়গুলির ব্যাপক ও সূক্ষ্ম চর্চা করা দরকার। এই সময় 'জ্যোতিষ' এবং 'আন্বীক্ষিকী', 'গণিত' বিদ্যাও চর্চা করা উচিত বলে মনে করেছেন। এছাড়া ছাত্র পাঠ্য পুস্তকাদি, 'হিতকর ও জ্ঞানকর' পুস্তক, ধর্মানুরাগ সৃষ্টির জন্যে ধর্মপুস্তক পাঠ, চরিত্র দোষ, লোভ যাতে না জন্মায় তার প্রতি নজর রাখা এবং যুযুৎসাদি ব্যায়ামে মন নিবেশ করা, এবং বিশ্ব পতির বিশ্ব কার্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয়ন করা এই স্তরের শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত বলে সুপারিশ করেছেন।

এই তিন স্তরের শিক্ষা চিন্তা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে অক্ষয়কুমার শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটেই কাল্পনিক ছিলেন না। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় ছিল যথেষ্ট। শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের যে গভীর সম্পর্ক আছে অক্ষয়কুমার তারই প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সমধিক। মানুষরূপে বাস্তবপৃথিবীতে আমাদের দাঁড়াতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন যে শিক্ষার সেই শিক্ষার কথাই তিনি বার বার ভেবেছেন। যে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণের জীবনের সম্পর্ক নেই অক্ষয়-কুমার সেই শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবেন নি। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন

'গ্রামে গ্রামে কৃষি বিদ্যালয় এবং শিক্ষা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তদ্ব্যতিরেকে অপর সাধারণের দৈন্য দশা দূরীভূত হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে।'১১

স্বাধীন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম থেকেই এই দুটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ক'রে তোলার সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে প্রয়োজন ভিত্তিক। অক্ষয়কুমারের মানসিকতায় এই দিকটি বহুকাল পূর্বেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্প বিদ্যার প্রয়োজন আজো স্বীকৃত হচ্ছে। অক্ষয়কুমারের প্রস্তাব আজ কার্যকরী হয়েছে ঠিকই কিন্তু কেউ তার নামও জানে না। বুনিয়াদী শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পরিচিত; কিন্তু অক্ষয়কুমারের পরিচয় নেই 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' অথবা 'সত্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে'র পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আমাদের জ্ঞান, কৌতূহল ও গুরুভক্তি কতদূর এক দেশদর্শী এ তারই চূড়ান্ত পরিচয় মাত্র।

অক্ষয়কুমার দত্ত বিশ্বাস করতেন 'ভাষা—শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান শিক্ষার উপায় মাত্র। ভাষা, জ্ঞানরূপ ভাণ্ডারের দ্বার স্বরূপ। সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে হয়। চির জীবনই কেবল দ্বার দেশে দণ্ডায়মান থাকিলে, কিরূপে জ্ঞান রূপ মহারত্ন লাভের সম্ভাবনা থাকে।'

তাঁর ধারণা ছিল ভাষা শিক্ষার জন্যে ঐ ভাষার 'পুস্তক পাঠ' 'লিপি-অভ্যাস' এবং 'প্রস্তাব রচনা' করা নিতান্ত দরকার। কেননা এই তিন উপায়েই ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান প্রচার করবার অধিকার জন্মায়।

বিজ্ঞার্জনের ক্ষেত্রে গণিত, জ্যোতিষ ও 'শিল্প-বিদ্যাদি' অধ্যয়ন প্রথম সোপন হিসাবে গণ্য করতেন। অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় ভূগোল চর্চা বরাবরই প্রাধান্য লাভ করেছে। নিজে স্কুলে পাঠ্য 'ভূগোল, (১৮৪১) লিখেওছিলেন। ভূগোল সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটিও বেশ উল্লেখযোগ্য। লিখেছেন,

'ভূগোল বিদ্যা অভ্যাস করিয়া দেশ, প্রদেশ, নগর, গ্রাম, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির স্বভাবসিদ্ধ ও মনুষ্য কল্পিত চতুঃসীমা অবগত হওয়া উচিত, এবং প্রত্যেকে দেশের জল, বায়ু ও ভূমির কিরূপ গুণ, তথায় কোন কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, এবং আচার ব্যবহার ও রাজ্যশাসনের কিরূপ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, এই সমুদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।'১২

ভূগোল বিদ্যার মাধ্যমে মানুষের জানার কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। জ্ঞানার্জনের মধ্যেই চিত্তের ঔদার্য সৃষ্টি হয়। অক্ষয়কুমারের তথ্য-নিষ্ঠা ও জ্ঞানস্পৃহা এই বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে

সম্পৃক্ত ছিল। উনিশ শতকে অক্ষয়কুমারের সমসাময়িককালে তাঁর চেয়ে বেশী জানতেন এমন বিদ্বৎজন খুব বেশী ছিলেন না। অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন তিনি। এবং অক্ষয়কুমারের এই জানার পদ্ধতিতেও ঝাঁক ছিল কম। প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনের প্রতিই তাঁর অধিক ঝোঁক ছিল। তিনি বলতেন, 'যে সকল সামগ্রীর বর্ণনাপাঠ করিতে হয়, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া গুণাগুণ পরীক্ষা করা কর্তব্য।'১৩ উত্তরকালে এই পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান করা উচিত বলে রবীন্দ্রনাথ বার বার উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'শিক্ষার মিলন' (১৯২১), 'শিক্ষার হের ফের' (১৮৯২) জাতীয় প্রবন্ধগুলির বক্তব্য প্রসঙ্গে সহজেই মনে আসে।

সাহিত্য-শিক্ষার প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার সাহিত্য-পাঠের উপযোগিতা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাতে তাঁর নন্দনতত্ত্বের বিশ্বাসকেই সমর্থন করেছে। 'অপার আনন্দ' ভোগের চূড়ান্ত কথাই ব্যক্ত ক'রেছেন। এক ধরণের mental pargation'র কথা এতে এসে পড়ে। অক্ষয়কুমার অবশ্য 'পরম পবিত্র পারমার্থিক' বর্ণনার ক্ষেত্রেই এই pargation'র উল্লেখ করেছেন। 'সাহিত্য-পাঠ দ্বারা সাত্বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, এবং যদি তাহাতে পরম পবিত্র পারমার্থিক বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহা অন্তঃকরণস্থ সৎ প্রবৃত্তি সমুদায় উদ্রত ও পরিশোধিত হইয়া অপার আনন্দ উদ্ভাবনা করে।'

অক্ষয়কুমার ভাবনা চিন্তার জগতে প্রকৃতই যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন তথা প্রগতিবাদী ছিলেন তার অন্যতম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর স্ত্রী শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে। স্ত্রী জাতি স্বভাব কোমল বলে কঠিন কাজে অক্ষম বলে মনে করা অসঙ্গত। স্ত্রী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজন আছে বলে তাঁর ধারণা। প্রাচীনকালে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ছিল বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এবং এখনো নিম্নলিখিত কারণের জন্যে নিম্নরূপ বিষয়ে স্ত্রী জাতির বিদ্যা-শিক্ষা প্রয়োজন বলে অক্ষয়কুমার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।১৪

	বিদ্যার প্রয়োজন	বিদ্যার বিষয়
(১)	মাতৃত্ব বিকাশের জন্যে	শারীরিক বিদ্যা
(২)	"	নিয়ম শিক্ষা
(৩)	সন্তানকে সুন্দর করবার জন্যে	মনোবিদ্যা, ধর্মনীতি
(৪)	শিশু যা দেখে তাতেই কৌতূহলী হয়। তার কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য।	বিশ্বব্যাপারে মায়ের ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করা কর্তব্য।

অতএব 'স্ত্রীগণের রীতিমত বিদ্যা-শিক্ষার প্রথা প্রচলিত না করিলে, কোনরূপেই আর ভদ্রস্থতা নাই।' 'মাতার প্রথমাবধি সন্তানকে বিনীত করা কর্তব্য। সুকুমার ক্রোড়ই তার যথার্থ বিদ্যাস্থান।'

আজ সামাজিক চেহারার প্রভূত বদল হয়েছে। স্ত্রী জাতির সামাজিক ভূমিকাও পাল্টেছে। এখন নারী কেবল সন্তানের জননী নন। এখন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমকক্ষ। কোথাও কোথাও বেশী। এখন স্ত্রী শিক্ষা পৃথক কোন সমস্যা নয়। এখন শিক্ষাই সমস্যা। সে সমস্যা জটিলতর। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই; কারণ এখানকার জটিলতর জীবন যাত্রা। শিক্ষা এখন জীবন মুখীন। কিন্তু সারা দুনিয়ায় যখন শিক্ষার গুরুত্ব জাতির সমস্যার সঙ্গে বিচার করে তার নব

মূল্য ধার্য করা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা সমস্যাকে কিন্তু এখনো জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব দিয়ে সঠিক মূল্য দেওয়া হচ্ছে না বলেই মনে হয়। এখনো এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কেবল গিনি পিগ্-পরীক্ষা করেই চলা হচ্ছে। যে বিষয়ের গুরুত্ব নিয়ে শতবর্ষ আগে অক্ষয়কুমার এত গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন তা নিয়ে এখানকার শিক্ষাবিদ্‌রা কী কিছু ভাবছেন? যদি ভাবেন এবং প্রসঙ্গ ক্রমে অক্ষয়কুমারের চিন্তাসূত্রগুলিও বিচার করে দেখেন একবার তাহলেই উনবিংশ শতাব্দীর এই অখ্যাতনামা শিক্ষাবিদের প্রতি হয়তো অনেকখানি সুবিচার করবেন। এবং এই সমস্ত সঙ্গত কারণেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডেভিড্ হেয়ার, বেথুন, ডাফ্, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, গুরুসদয় দত্ত প্রমুখ শিক্ষাবিদদের সঙ্গে অক্ষয় দত্তের নামও পরিচিত হওয়া উচিত।

---

১. Duff., A., India and Indian missions (Edin : 1879), appendix
দ্রঃ বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ, (১২৭৩), ৭৭

২. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ সংস্করণ (১৯৫৫), ১৯০।

৩. ১৮৫৭-৫৮'র (নভেম্বর—মে) মধ্যে ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন।

৪. ঈশ্বরগুপ্ত, গ্রন্থাবলী।

৫. Bagol, J. C., Beginnings of modern Education in Bengal : women's Edin, appendix, 70
দ্রঃ তদেব, বাংলার স্ত্রী শিক্ষা : বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ৮৫ সংখ্যক, (১২৫০), ১।

৬. 'আমি বেথুন সাহেবের বালিকা-বিদ্যালয়ে দৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।'

৭. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, (১) ৪৫ সংখ্যা

৮. দ্রঃ সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪), ৫২।

৯. অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্মনীতি (১৮৫৬), ১২৬।

১০. অক্ষয়কুমার, পূর্বে উল্লিখিত, ১৬৩।

১১. অক্ষয়কুমার দত্ত, পূর্বে উল্লিখিত, ১৬৪।

১২. তদেব, ১২১।

১৩. তদেব,।

১৪. অক্ষয়কুমার, পূর্বে উল্লিখিত, ১২৭-১৩১।

লোকচিত্রের ভাষা

অজিতকুমার মিত্র

লোক সাহিত্য গাথা গীতিকা কথা কিংবদন্তীর মতই লোকচিত্রেরও ভাষা আছে। এই চিত্রগুলির প্রতি বাঙালী জীবনের মোহও কম নয়। গ্রামীণ সংস্কৃতির পর্যালোচনা করলে লৌকিক চিত্রাংকন রীতির যে ধারা ও ধারণা প্রতিভাত হয়ে ওঠে তা ভাবতে গেলে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। নাচ গানে ভরা বাঙালী জীবনে মরমী শিল্পীমন লৌকিক চিত্র রচনার ক্ষেত্রেও যে তন্ময়তার সৃষ্টি করে তার তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কোন বিস্মৃতকাল হতে প্রবাহিত চিত্রাংকন ধারায় বাঙালী মননের বিভিন্ন অভিপ্রায় আশা আকাংক্ষা সুপ্তশয়ান রয়েছে।

বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠানে আলপনা দেওয়ার রীতি এবং প্রচলিত বিভিন্ন ক্রিয়া কাণ্ডে তেল সিন্দুরের ছবি, হলুদ বাঁটার সাংকেতিক চিহ্নাদি অংকন কখনও বা গৃহসজ্জার চিত্রাদির চিত্রণ করা হয়। পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঘরের দুয়ারের চৌকাঠে ছবি আঁকবার প্রথা আছে। এই সব চিত্রগুলি বহুকাল থেকে একই ধারায় প্রচলিত। এমন কি একই রংয়ে একই চিত্রাদি চিত্রিত করার রীতি আছে। আভিচারিক ক্রিয়াকাণ্ডে মন্ত্রচর্য্যার সময় বিভিন্ন লৌকিক ছবি তেল কালিতে, কাজল কালিতে আঁকবার প্রথা এখনও গ্রাম বাঙলায় দেখা যায়। জলপূর্ণ মংগল কলসে তেল সিন্দুরে নানা প্রকার সাংকেতিক চিহ্ন অঙ্কন করা হয়। ঘট বারিতে লোক দেবীকে আহ্বান করে ঐ ঘটে মনসা গাছের শাখার টুকরো বা আমের পল্লব দিয়ে নতুন লাল কাপড়ে বৌমা সাজিয়ে দেবীর ঘটস্থাপন করা হয়। ঘটের গায়ে নানা রকম নক্সার সাথে একজড়া সাংকেতিক চিহ্ন অংকন করা হয়। এই চিহ্নকে অনেক গ্রামে 'পুকুলা' বলে। কোথাও কোথাও 'পুত্‌তলা' ও বলে। খড়িমাটি দিয়ে সমস্ত ঘর নিকানোর পর আদিবাসীরা ঘরের বাইরে ও ভেতরে নানা রকম নক্সার সাথে গিরি পাথর ঘসার রং দিয়ে এই সাংকেতিক ছবি দুটি অংকন করে।

কি আদিবাসীর গৃহ সজ্জায় কি গ্রামের গৃহস্থের বিভিন্ন প্রকার লৌকিক চিত্রাংকনের সময় এমন কি কুল-বধূদের আলপনা দেওয়ার রীতিতে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে একই মাপের দুটি ছাতার বাঁটের মত প্রান্ত বাঁকা ছোট লম্বা দাগ বাঁকা প্রান্ত দুটিকে সংলগ্ন করা হয়। তারপর ঐ লম্বা দাগের মাঝ খানে হাতের মত দু'পাশে দুটি করে দাগ দেওয়া হয়। ভেতরের দিকের বাহুর মত দাগ দুটি পরস্পর মিশে যায়। ঐ বাহু দুটি ডানার মত আবার সমগ্র ছবিকে মানুষ ভাবলে ঐ দাগ দুটিকে হাতের মত মনে হয়। ছবি দুটিকে জড়াজড়ি দুটি মানুষের মত কল্পনা করা অসমীচিন নয়। তেল সিন্দুরে, হলুদ বাঁটা, পিঠুলি বাঁটায়, লাল কাল রং এই ছবি অংকন করা হয়। আদিবাসীদের গৃহ সজ্জায় তো এই ছবিদুটি আঁকা থাকবেই। সাঁওতালরা তাদের পূজা উৎসবে নানা রকম চিত্রাংকনের মধ্যে এই ছবি আঁকতে ভোলে না। কিন্তু ছবি দুটির অর্থ কেউ বলতে পারে না। কোন্ বিস্মৃত কাল থেকে লোক প্রচলিত এই চিত্রাংকন ধারা আজও মানুষ বজায় রেখেছে। সমাজের পুরুষ পরম্পরায় যুগ থেকে যুগে এই সাংকেতিক চিত্রাংকন ধারা প্রবাহিত।

আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও মহলী, রানা, ধাঙর-কোঁড়া প্রভৃতি জাতির সমাজ জীবনে নানা প্রকার চিত্রাংকনের মাঝে এই সাংকেতিক চিহ্ন অবশ্যই আঁকা হবে। তাদের পূজার সময় এমন কি বলিদানের কাঠে তেল সিন্দুরে আঁকা থাকে এই যুগল চিহ্ন। ভুতুড়ে হাওড়া ঝোঁপের শূন্য বেদীতে হলুদ বাঁটার এই ছবি তৈরী করা হয়। পণ্ডিতরা বলেন সন্তান ও শস্যের কামনা মানুষের আদিম আকাংখা। এই কামনাই সমাজ গঠনের জন্য প্রমোদিত করে। অন্তর্নিহিত আদিম কামনা মানুষের সভ্যতা সৃষ্টির মূল উৎস। এই আদিম চিত্রাংকন ধারা পর্যালোচনা করলে একথা অবিসম্বাদিত যে ঐ রেখাংকিত সাংকেতিক চিহ্ন দুটি নরনারীর। একটি পুরুষের প্রতি একটি নারীর টান আর একটি নারীর প্রতি একটি পুরুষের টান ঐ সাংকেতিক চিত্রাংকন ধারার মর্মকথা। দাম্পত্যই মানুষের আদিম কামনা। কোন আদিম কাল হতে এই ছবি আঁকা হয়। কাল হতে কালে এই সাংকেতিক চিহ্ন আকার রীতি প্রচলিত থেকে আদিম সমাজ হতে বিভিন্ন সমাজকে প্রভাবিত করে চলেছে। তাই দাম্পত্যই মানুষের আদিম কামনা। সন্তান এই মিলনের পরিণাম মাত্র। সন্তানের কামনা মানুষের প্রথম বাসনা নয়। কেন না সম্ভোগ প্রক্রিয়া মানুষকে আবিষ্কার করতে হয়। অসচেতন কোন অকস্মাৎ মুহূর্তে মানুষ সৃষ্টির তাগিদে হঠাৎ যৌনচরিতার্থতার আস্বাদন পায়। আর শস্যর আকাংখা এই দাম্পত্যকে অটুট রাখার উপায় মাত্র।

সাংকেতিক চিহ্ন দুটি যে আদিবাসী সমাজেই প্রথম উদ্ভাবিত হয় তার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। সাঁওতালী লোক পুরাণে পৃথিবীর জন্মের আদিতে দেখা যায় কেবল জল আর জল। মাটি ছিল না কোন জীবজন্তুও ছিল না। এমন কি মানুষের জন্মও হয় নি। দুটি সাদা হাঁস কিন্তু যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের পর সমুদ্র পেরিয়ে সাঁতার কেটে আসছিল। সর্বত্র কেবল জল আর জল। ভীত চকিত হাস দুটি প্রায় যেন পাগল হয়ে যায়। কেন না হাস হাঁসিল বিশ্রামের কোন স্থল পাচ্ছিল না। প্রলয় পয়োধি জলে যেন দুটী সাদা বিন্দু। এই বিন্দুই সৃষ্টির আদিম রহস্য। এই বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু যেন কল্লোলিত। প্রায় ক্লান্ত হয়ে এসেছে হাঁস হাঁসিল এমন সময় তারা মাটির সন্ধান পেল। সৃষ্টিকে রক্ষার তাগিদে মাটি জেগে উঠেছে। মাটির অস্তিত্ব পেয়ে জীবনের আনন্দ সূর্যের আলোয় আলোয় বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে। সেই আশ্রয় স্থলকে প্রণাম জানিয়ে বললে তারা—নোওা। অর্থাৎ আশ্রয় দাতা। তারপর হাস হাঁসিল বনে জংগলে আনন্দে লুটোপুটি করে বেড়াতে লাগলো। আনন্দের হুল্লোড় বয়ে যায়। তারা বাসা বাঁধে। এবার তারা সম্ভোগের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলো হঠাৎ। নিবিড় আশ্রয়ে একটি ডিম পাড়লো হাঁসিল। ঐ ডিমটি থেকে দুটী মানুষ জন্মালো। একটী নর আর একটী নারী। অন্য সাঁওতালী লোক কথায় জানা যায়—চটরে মারাং রারা তাহাকানা। মারাং রারা পাতালার ডেবার ফেডো আই। উনজুথান মারাং রুরু দঃ দাকাইয়া। পৃথিবী জলে জলময় ছিল। মারাং রুরু আর মারাং রুরুর স্ত্রী ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না। এই গল্পে ত একটি পুরুষ আর একটি নারী ছাড়া আর কেউ নেই। পৃথিবী শুধু জলময়। কিভাবে একটি থেকে দুটি হলো তার কথাই মানুষের আদিম কৌতুহল। লোক কথাগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত যে বারে বারে একটি পুরুষ আর একটি নারীর কথাই শোনা যায়। পৃথিবী তো জলে জলময়। খাওয়া-দাওয়া ভুলে ঠাকুর কিন্তু ঘুড্ডি ওড়াচ্ছে। ঠাকরুণ খাবার নিয়ে বসে আছে। ঠাকুরের আর পাত্তা নেই। ঠাকরুণ আর

সহ্য করতে পারলো না। ক্রোধে ফেটে পড়লো। তাড়াতাড়ি এসে ঠাকুরের ঘুড্ডিটা দু' টুকরো করে দিলো। যেই না দু' টুকরো করা অমনি টুকরো দুটি গুড্ডু পাখী হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগলো। তারপর তাদের আশ্রয়ের জন্য ভগবানকে মাটি সৃষ্টি করতে হলো। গাছ-পালা বন-জংগল খাবার সব সৃষ্টি করতে হলো কত প্রক্রিয়ায়। তারপর গুড্ডু পাখী একটী ডিম পাড়লো। ঐ ডিম ফুটে জন্ম হলো পিলচু হারাম আর পিলচু বুড়ির। সেই দুটি মানুষের কথা। তাদের আবার সাত জোড়া ছেলেমেয়ে হলো। জোড়ায় জোড়ায় পৃথিবীতে সাতটি গোত্রের সূত্রপাত করলো ঐ ছেলেমেয়েরা—যথা হাঁসদা, মুর্মু, কিসকু, হেমব্রম, মাণ্ডি, সরেণ, টুডু।

মানুষের মিলিত হওয়ার বাসনা যে কত দুর্দমনীয় তা' কল্পনা করা যায় না। আদিবাসী লোক রচনায় এই মিলিত হওয়ার অনেক কথা কাহিনী গাথা গল্প প্রচুর ছড়িয়ে আছে। পিলচু হারাম পিলচু বুড়ির ছেলে আর মেয়েরা ভাই বোন, তবুও তাদের মিলন হলো। এছাড়া কোন উপায় ছিল না ঠাকুর মারাং রুরুর। কেন না এইভাবে তাকে মানুষ সৃষ্টি করতে হয়েছে। আর মিলিত থাকার জন্যে নানারকম গাছের শেকড় আর মহুয়ার নির্যাস দিয়ে মদ তৈরী করে সেই মদ খাওয়াতে হয়েছে তাদের। মদ না খেলে সম্ভোগের উন্মাদনা আসবে কি করে। মদ খেয়ে তারা হুল্লোড় করেছে :—

যুবকেরা যুবতীদের বলে :—

মুচকু মাকু দুংগু দুংগু দঃ।
বাপবারি লাতার ডের রিকু
দুঃগু দুঃগু দঃ॥

যুবতীরা আবার যুবকদের বলে :—

বুনম্ দানাং রেঃইয়া ঝিক্ দঃ।
তিননার ওরেজা ঝিক্ দঃ॥
লেরদা হসর রেইয়া ঝিক্ দঃ॥

হৈহুল্লোড় আরম্ভ হলো। গানের হুল্লোড়ে বনের পাখীরা কলরব করতে করতে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগলো। শ্বাপদ জন্তুরা ভয়ে নির্ভরযোগ্য স্থানে পালাতে থাকে। একটি পুরুষ আর একটি নারীর মিলনের অপূর্ব গাথা সঞ্চিত হয়।

হিন্দুদের পুরুষ প্রকৃতির কথা সর্বজন বিদিত। এখানে হরহরি এক দেহে অর্ধনারীশ্বর। হরগৌরী কি আদিম বাসনার চিরন্তন মিলনের শাশ্বত রূপ নয়। আমাদের সাহিত্য এবং ধর্ম কথায় দু'জনের মিলিত থাকা একাকার হয়ে আছে। আদম আর ইভ তো চিরকাল মিলিত থাকতে চেয়েছিল। নিষিদ্ধ ফলের কাথ জারিয়ে আরক হয় কিন্তু। সেই নিষিদ্ধ ফলের নির্যাসে কি নেশা। কি অনুতাপ মানুষের। নিষিদ্ধ ফলের নির্যাস খেয়ে মানুষ কামের জ্বালায় অস্থির হয়ে গেছে। সে কি যন্ত্রণা। তারই জ্বালা ছুটে বেড়াচ্ছে আকাশে-অন্তরীক্ষে, জলে স্থলে এমন কি পাতালে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় শিশুদের মধ্যে পুতুল তৈরীর প্রবণতা রয়েছে। একটি বৌ আর একটি স্বামী তৈরী করবার জন্য শিশুরা উন্মুখ। তারা সাধারণতঃ মাটি দিয়ে পুতুল তৈরী করে। ন্যাকড়ার পুটলী দিয়েও পুতুল তৈরী করার রীতি প্রচলিত। গৃহ সজ্জার ছবিতে, আলপনায়,

দেবস্থানের মাংগলিক চিহ্ন ঘটে, পটে হাঁড়িতে মংগল কলসে আঁকা সাংকেতিক চিহ্ন দুটি যদি নর-নারীর ছবি হয় তা' হলে একথা একথা বিশেষ ভাবে বলা যায় যে শিশুদের পুতুল খেলায় তারা এক রকমের পুতুল তৈরী করে যা' দেখলে ঐ সাংকেতির চিহ্ন দুটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অমনি বাঁকা বাঁকা হাত আর পুতুল দুটির মুখ সামনে দিকে ঈষৎ বাঁকানো। বুক আর পুতুলের শেষ প্রান্ত এক রকমই। পা' দুটি নেই। কোমরের নীচে থেকে পায়ের অংশ সরু হয়ে পায়ের পাতার অংশ বেশ মোটা। দাঁড় করিয়ে দিলে দাঁড়িয়ে যায়। পুতুল দুটি বসানো থাকলে আলোচ্য ছবির মত মনে হয়। অনেক সময় স্থাকড়া দিয়ে তৈরী পুতুলের আকৃতিও শিশুরা ঐ ছবির মত তৈরী করে। পুতুল তৈরীর পুরোনো ধারা এখনও শাশ্বত শিশুমনে বেঁচে আছে। এই ধারা হয়তো ঐ চিত্রাংকন ধারার সাথে একই উৎস থেকে উদ্ভূত। এ কথা চিন্তা করা অসমীচিন নয়। মানুষের মিলিত থাকার ইচ্ছা আদিম কালেই চিত্রে, ভাস্কর্যে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তার মূল্যে কিন্তু লৌকিক প্রেরণা প্রমোদনা সৃষ্টি করে তা' এই চিত্রাংকন রীতি আলোচনা করলে বিশেষ ভাবে জানতে পারা যায়।

বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে তাই আদিম বাসনা একত্র থাকার। একটি পুরুষ আর একটি নারী পরস্পরকে চেয়েছিল প্রথম কোন বিস্তৃত অতীতে। দু'জনেই পরস্পরকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল একান্ত বিস্ময়ে। এত বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পৃথিবীতে আর কিছু নেই। পুরুষ নারীকে খুঁজে বের করেছিল বৈজ্ঞানিক মননশীলতায় ভাল লেগেছিল তাই ভালোবেসেছিল। মনুষ্য জাতির বিবর্তনের ইতিহাস তাই এই দু'জনের ইতিহাস। ঈশ্বর এক থেকে নাকি বহু হয়েছিল। কিন্তু এক থেকে দুই না হলে বহু হওয়া যায় না। তাই তিনি এক থেকে দুই হয়েছিলেন। এই দু'জনই বহু জন হয়ে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়। লোকচিত্রের রেখায় রেখায় তাই এই দু'জনের ছবি তাদের লৌকিক জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে এখনও তার ব্যত্যয় দেখা যায় না।

মলিয়ের ও বাংলা নাটক

জগন্নাথ ঘোষ

শুধু ফরাসী নাট্যসাহিত্যে নয় বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে মলিয়ের (১৬২২-১৬৭৩) একটি উজ্জ্বল নাম। ফরাসী রঙ্গালয়ে তাঁর আবির্ভাব নাট্যকার ও প্রযোজক রূপে। বলতে দ্বিধা নেই ফরাসী রঙ্গালয়কে তিনিই জনপ্রিয় করে তোলেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মলিয়ের ফরাসী রঙ্গালয়ের সঙ্গে অবিছিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন। যৌবনেই তিনি স্বদেশে অপমানিত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে নিজস্ব একটি থিয়েটার গড়ে অভিনয় করে বেড়াতেন। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মলিয়ের-এর জীবন এইভাবে কাটে। অবশেষে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তখন ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই তাঁকে রাজন্যবর্গের সম্মুখে অভিনয় করার উপর অনুমতি দান করেন। রঙ্গালয়ের গরুড় স্থখা মেটাবার জন্য মলিয়ের নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় মলিয়ের-এর আসল নাম Jean Baptista Poquelie' থিয়েটারী নাম মলিয়ের।

মলিয়ের যাবতীয় নাট্যরচনাই কমেডি। তাঁর কমেডিগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে তৎকালীন সমাজের অসংগতি ভণ্ডামি, অজ্ঞানতাও অন্ধকুসংস্কার। এক কথায় সামাজিক অন্যায় ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে মলিয়ের-এর সোচ্চার বিদ্রোহ তাঁর কমেডিগুলো।

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাংলা নাট্যসাহিত্য নব নব সৃষ্টির সম্ভারে ভরে উঠতে লাগল তখন সেখানেও সামাজিক ভণ্ডামি, ব্যাভিচার কুসংস্কার অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ পুনঃপুনঃ ঘোষিত হতে থাকল। বাংলা প্রহসনগুলোর পুঁজি ছিল ওই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। প্রহসনকারেরা উনবিংশ শতকের উত্তাল মুহূর্তে দাঁড়িয়েও সপ্তদশ শতকের ফরাসী প্রহসনকার মলিয়েরের কথা স্মরণে না এনে পারেন নি।

কাগজে কলমে বাংলা প্রহসনে মলিয়েরের উপস্থিতি বোধহয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ। ঐ বছর প্রকাশিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এই প্রহসনখানি মলিয়েরের তারত্যুফ (Tartuffe) প্রহসনের দ্বারা প্রভাবিত। অবশ্য ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এই প্রভাবের কথা স্বীকার করেন না। (১) তবে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়ের উপর 'তারত্যুফের' প্রভাব একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মলিয়ের বাংলা নাট্যসাহিত্যে আপন আসন পাকা করে নিলেও নাট্যমোদী—বাঙালী মলিয়েরের নাম তারও ৭৫ বছর পূর্বেই শুনেছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হেরাসীম লেবেডফ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য দুখানি ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। এই দুখানি নাটকের নাম 'ডিজগাইজ' এবং লাভ ইজ দি বেকট ডকটর। শেষোক্ত খানির অভিনয়ের খবর পাওয়া না গেলেও একথা জানা গেছে যে এখানি মূলতঃ মলিয়েরের লা আমোর মেদিসিন নামক প্রহসনের ইংরেজী অনুবাদ। অবশ্য একথা লেবেডফ উল্লেখ করেন নি।(২) তবে উল্লেখ না করাটাই বড় কথা নয়। লেবেডফ তাঁর বাংলা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সহায়তায় 'ডিস্‌গাইজ' ও 'লাভ ইজ দি

বেষ্ট ডক্টরের বাংলা অনুবাদ করেন। 'লাভ ইজ দি বেষ্ট ডক্টরের' বঙ্গানুবাদটি পাওয়া যায়নি। ১১২ বছর পরে এই নাটকটির দ্বিতীয়বার অনুবাদ হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতে। তিনি তাঁর অনুবাদের নাম দেন 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' (১৯০৭)। গিরিশচন্দ্রের এই অনুবাদ সম্পর্কে ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'মলিয়ের-এর কমেডির মূল কাহিনী গিরিশ ধরেছেন, Sganarel (সম্পত্তির ভয়ে কন্যা বিবাহদানে ভীত পিতা), Lucinda (নায়িকা) ও Lysetta (পরিচারিকা ও নায়িকার সখী এবং Physicians চরিত্রগুলির ভাব গিরিশের প্রহসনে মোটামুটি বজায় আছে। তবে মলিয়রের নাটকে কোন গরব প্রণয়ী মানিক নেই, নৃত্যগীত বিশেষ নেই। গিরিশচন্দ্র মলিয়রের সংযত কটাক্ষ বাকচাতুর্য কিছু ফোটেনি।"

গিরিশচন্দ্রের 'য্যায়সা কা ত্যায়সা'র জনপ্রিয়তা আজও হ্রাস পায়নি। এই ১৯৭৩ সালেও এই প্রহসনটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা। বলতে দ্বিধা নেই, 'য্যায়সা কা ত্যায়সা'র জনপ্রিয়তা প্রকারান্তরে মলিয়েরেরই জনপ্রিয়তাকেই প্রমাণিত করে।

নাট্যকার দীনবন্ধুর উপর মলিয়েরের প্রভাব আছে কিনা, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কিছু জানা যায় না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রহসন রচনা করার মানসিকতা মলিয়ের ও দীনবন্ধু মিত্রের সমান ছিল।৪

বাংলা নাট্যসাহিত্যে মলিয়েরকে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর দুখানা বিশিষ্ট প্রহসন 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪) এবং 'দায়ে পড়ে দার গ্রহ' (১৯০২)। 'হঠাৎ নবাব' মলিয়েরের Le Burgeois Gentil homme এর অনুবাদ। Le Burgeois Gentil homme একখানি musical comedy। এটি রচিত হয় ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই এর নির্দেশে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই প্রহসনটি অনুবাদের সময় ফরাসী প্রহসনটির চরিত্রগুলির নামের ধ্বনি সংগতি রক্ষা করেছেন। Jourolian, Cleonte, Lucile, Covicille প্রভৃতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে হয়েছে যথাক্রমে জুর্দন খাঁ, রোষনী, কবলু খাঁ। এমন কি মলিয়েরের প্রহসনের অঙ্ক বিভাগ প্রণালী ও গান সন্নিবেশের কৌশলও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হুবহু গ্রহণ করেছেন।

মলিয়েরের মারিয়াজ ফোর্সে অবলম্বনে রচিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দায়ে পড়ে দার গ্রহ'। 'দায়ে পড়ে দার গ্রহে' ফরাসী প্রহসনের নাম চরিত্রগুলির পরিবর্তিত হয়েছে। এছাড়া ন্যায়রত্ন ও বেদান্তবাগীশ এই দুইজন টুলো পণ্ডিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনে নতুন আমদানী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অলীকবাবু মলিয়েরের অনুসরণে রচিত না হলেও মলিয়েরের নাট্যাদর্শে যে রচিত তাতে দ্বিমত থাকার কথা নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পর যেসব নাট্যকার উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মলিয়েরের প্রহসনের অনুবাদ এবং ছায়া অবলম্বনে নাট্যরচনায় লিপ্ত ছিলেন তাঁরা হলেন গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র। গিরিশচন্দ্রের 'য্যায়সা কি ত্যায়সা'র কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। রসরাজ অমৃতলাল বসু মলিয়েরের L' E'cole desfemmes (The School for wives) ও L' Avare (The Miser) এই দুখানি প্রহসনের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন যথাক্রমে 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৮৭৬) ও 'কৃপণের ধন' (১৯০০)। অবশ্য কৃপণের ধনে শেক্সপীয়রের মারচ্যাণ্ট অব ভেনিসের প্রভাবও রয়েছে।

'চোরের উপর বাটপাড়ি' সম্পর্কে ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন 'প্রহসন খানার ঘটনার সরস জটিলতা এবং রুচি-গর্হিতি, পাশ্চাত্য প্রহসন বিশেষ করিয়া মলিয়েরের প্রহসনের সম্ভাব্য প্রভাব মনে করাইয়া দেয়। আলোচ্য প্রহসনের মধ্যে কৌতুকের চমৎকারিত্ব এইখানে যে, নারায়ণ অঘোরের কাছে 'রসোদ্গার' করিয়াছে, অথচ অঘোর তাহাকে ধরিতে যাইয়া প্রতিবারই ব্যর্থ এবং বেয়াকুব হইয়াছে। মলিয়েরের The School for wives (L' E'cole desfemmes) প্রহসনে ঠিক এইরূপ একটি ব্যাপার আছে।'৫

'কৃপণের ধন' প্রহসনে মলিয়েরের প্রহসনের প্রভাব সম্পর্কে ডঃ অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'কৃপণের ধন' মলিয়েরের 'The Miser (L' Avare) নামক প্রহসনের দ্বারা প্রভাবান্বিত। মলিয়েরের প্রহসনে Harpagon এর কার্পণ্য-দোষের সহিত তাহার ইন্দ্রিয় পরায়ণতা দেখানো এবং পরস্পর সংযুক্ত জটিল প্রেম কাহিনীও সেই সঙ্গে রহিয়াছে। কৃপণের ধন এও হলধরের কার্পণ্য এবং নারী সম্পর্কিত দুর্বলতা এইপ্রকার দোষ বিদ্যমান এবং মন্মথ ও কুসুমার প্রণয় ব্যাপার হলধরের কাহিনীর সহিত যুক্ত হইয়াছে।'৬

গিরিশযুগের অন্যতম স্মরণীয় নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'তুফানী' (১৯০৮) 'প্রাণের টান' (১৯১২) প্রহসন দুখানি যথাক্রমে মলিয়েরের L' E'tourdi প্রহসনটির Mascarille চরিত্রটিই অতুলকৃষ্ণকে তাঁর তুফানী চরিত্র আঁকতে অনুপ্রাণিত করে। তুফানীও একজন সুধন্য ভৃত্য।

'প্রাণের টান' প্রহসনের ভূমিকায় অতুলকৃষ্ণ লিখেছেন, 'সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার (Moliére) মোলেয়ারের (Le D'epit Amoveess or Lover's quarrels) নাটিকার ছায়া অবলম্বনে রচিত।' 'প্রাণের টান' এ লখোদর ও কৃশাঙ্গ নামে দুটি ভৃত্য চরিত্র আঁকা হয়েছে। বলাবাহুল্য, তুফানী রচনার পর অতুলকৃষ্ণ যতগুলি প্রহসন লিখেছেন, প্রায় সবগুলিতেই তুফানীর মত ভৃত্যজাতীয় চরিত্র লক্ষিত হয়। প্রকারান্তরে এ চরিত্রগুলি মলিয়ারের প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রংরাজ-এর (১৯০৯) রংরাজ, ঠিকে ভুল-এর (১৯১০) সমঝ, প্রভৃতি চরিত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অতুলকৃষ্ণ উল্লেখ না করলেও আমাদের জানতে বাকি থাকে না যে, তাঁর দমবাজ (১৯০৮) নাট্যরঙ্গটি মলিয়েরের তার্তুফ এর ভাবানুসরণে রচিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রহসনগুলিতে অগ্রাধিকার পেয়েছে নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিত, বিলাতফেরত, স্ত্রীশিক্ষার বাড়াবাড়ি প্রভৃতি। এই প্রহসনগুলি রচনায় প্রত্যক্ষভাবে নাট্যকার যার কাছ থেকেই সাহায্য পান বা প্রভাবিত হোন না কেন, মলিয়েরের প্রভাব যে সেখানে লুকিয়ে আছে, সে কথা স্বীকার করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রহসনে মলিয়েরের প্রভাবের কথা জানা না গেলেও রবীন্দ্র পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে কম বেশি মলিয়েরের প্রভাব চোখে পড়ে।

প্রমথনাথ বিশীর প্রহসনে হাস্যকৌতুকের সংগে মিশে আছে অপূর্ব প্রণয়মাধুর্য। বলাবাহুল্য এই আদর্শ মলিয়েরের আদর্শকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তার 'ঋণং কৃত্বা' ও ঘৃতং পিবেৎ এই দুখানি প্রহসন আলোচনা করলে তা জানা যাবে। 'ঋণং কৃত্বা'র প্রধান ঘটনা সনৎকুমারের ঋণ শোধ স্থল প্রতিষ্ঠা এবং সেই স্থলে মহাজনের ঋণ পরিশোধ না করার শিক্ষাদান। কিন্তু প্রহসনটিতে এই ঘটনাই

প্রাধান্য পায়নি। পেয়েছে সনৎ মঞ্জরী ও ললিত-মণিকার প্রণয় ঘটিত সমস্যার জটিলতা, এই জটিল সমস্যার সমাধানে প্রহসনটির সমাপ্তি ঘটেছে। মলিয়ের তাঁর নাটকেও এইরকম যুগল চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের ক্রিয়াকলাপ ও বাগজালবিস্তারের দ্বারা কৌতুক রস পরিবেশন করেছেন। প্রমথনাথও মলিয়েরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর প্রথম প্রহসন 'ঋণং কৃত্বা' রচনা করেছেন। ঋণং কৃত্বার পরবর্তী প্রহসন 'ঘৃতং পিবেৎ'। এই প্রহসনটি মলিয়েরের The cit Turned gentleman' প্রহসনটির আদর্শে রচিত। মলিয়েরের প্রহসনে যেমন রয়েছে ঘটনার সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য প্রমথনাথের 'ঘৃতং পিবেৎ' এও অনুরূপ পরিবেশ রচিত হয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রহসনে (ভাড়াটে চাই, বারোভূতে) লক্ষিত হবে তীক্ষ্ণ শানিত সংলাপ, জটিল কৌতুককর পরিবেশ সৃষ্টি। কোন প্রসঙ্গের আকস্মিক উত্থাপন প্রভৃতি। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের সংগে বিশেষভাবে পরিচিত এই নাট্যকার যে মলিয়েরের নাট্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিককালে 'এপিক' নাট্যগোষ্ঠী মলিয়েরের বিখ্যাত প্রহসন 'তার্ত্যুফ এর বঙ্গানুবাদ 'মহাত্মা' অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেছেন। উক্ত অনুবাদটি করেছেন লোকনাথ ভট্টাচার্য। সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সের ধর্মীয় ভণ্ডামিকে আক্রমণ করার জন্য মলিয়ের রচনা করেছিলেন 'তার্ত্যুফ। তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য বকধার্মিকতা, গির্জা বা ধর্ম নয়। লোকনাথের 'মহাত্মায়' এই বকধার্মিকতাকেই আক্রমণ করা হয়েছে। 'মহাত্মা' সম্পর্কে অভিনয় পত্রিকার (ডিসেম্বর ১৯৭১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২) মন্তব্যটি স্মরণীয় 'স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী লোকনাথ ভট্টাচার্য অনূদিত এ-নাটিকাটি তার তিন শতাব্দী পূর্বেকার কাব্যকায়াটি হারিয়েছে বটে কিন্তু তার কাব্যিক মেজাজ ও Commedia dell arte এর স্টাইলটি মলিয়ের নির্ধারিত মসৃণতা নিয়ে, বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সাজ পরে উপস্থিত হয়েছে।'

বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে মলিয়ের একটি স্মরণীয় নাম। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালী মলিয়েরকে ভুলতে পারে নি। বোধহয় কোনদিন পারবেও না। কারণ বাঙালী মানসিকতার সংগে মলিয়েরের মনোধর্মের মিল আছে। এই মিলকে খুঁজে পেয়েছিলেন হেরাসীম লেবেডফ এবং তাঁর বাংলা ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাস। লেবেডফের পর বিভিন্ন যুগের স্মরণীয় বাঙালী নাট্যকারগণ প্রহসন রচনায় নাটকে রঙ্গব্যঙ্গ পরিবেশনকালে বারবার মলিয়েরের দ্বারস্থ হয়েছেন। বোধহয় একমাত্র শেকসপীয়রকে ভুললেও মলিয়েরকে কোনওদিন ভুলবে না। এই মলিয়েরের প্রতিসম্মান প্রদর্শন শুধু তার নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে করা হলেও বাংলা ভাষায় তাঁর যাবতীয় রচনার অনুবাদ হওয়া উচিত। বাংলা নাট্যসাহিত্যে মলিয়েরের প্রভাব এবং অবদান সম্পর্কেও বিস্তৃত গবেষণা হওয়া দরকার। এই দরকারী কথাটাকে বাঙালীর যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেই হবে।

---

১. মাইকেল মলিয়ের হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। (বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ! ৫ম সংস্করণ ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১০১—১০২)

২. 'ফরাসী নাট্যকার মলোয়ারের 'লাভ আমোর মেডিসিন' নামক একটি প্রহসন আছে। Love is the Best Doctor তাহার ইংরেজি অনুবাদ হওয়া অসম্ভব নহে।' পৃঃ ৫৫০।

৩. গিরিশ রচনাবলী (১ম) গিরিশচন্দ্র ঘোষ : সাহিত্য সাধনা পৃঃ ৬৯—৭০। সাহিত্যসম্পদ।

৪. ফ্রান্সের বিখ্যাত নাট্যকার মলিয়েরের আদর্শ নায়ক হয়তো অ্যালসেসটিস। যে পৃথিবীকে ও মানবসমাজকে অকৃত্রিম অকপট ও পরিশোধিত দেখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু যাহারা কৃত্রিম ভণ্ড, অনুদার তাহাদের নিয়াই মলিয়েরের চিত্ত উল্লসিত থাকিত। আমাদের দীনবন্ধু যখন কোন আদর্শ সৎ ও মহৎ চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়াছেন তখন তাহার মন সায় দিয়াছে বটে, কিন্তু চিত্ত সাড়া দেয় নাই। কিন্তু যখন জলধর নিমচাঁদ, রামমাণিক্য কেনারাম, রজীব, বগলা, বিন্দুবাসিনী প্রভৃতি তাঁহার নাটকের আসরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখনই তিনি তাহাদের সহিত মিশিয়া বিচিত্র রঙ্গরসে জমিয়া গিয়াছেন।' (বাংলা নাটকের ইতিহাস ডঃ অজিতকুমার ঘোষ পৃঃ ১০৫)।

৫. বাংলা নাটকের ইতিহাস : ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। পৃঃ ২৪৬—৪৭)।

৬. বাংলা নাটকের ইতিহাস : ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। পৃঃ ২৪৮

৭. Mascritta the comic servent of L' Etowide—Molicre's ownpart is a real creation—A History of Western Literature : J. M. Coten Page—185.

৮. সমাজ বিভ্রাট ও কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭) পরিবার (১৯০০) ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী। প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২) পুনর্জন্ম (১৯১১) এবং আনন্দ বিদায় (১৯১২)।

রামকৃষ্ণ কাব্যের উপেক্ষিত

হরতোষ চক্রবর্তী

যুগাবতার রামকৃষ্ণ। মানবজীবনের চরমতম এবং পরমতম উৎকর্ষের প্রতীক। যুগান্তকারী তাঁর ধীমান শিষ্য বিবেকানন্দ—তেজে, বীর্যে, দীপ্ত, অনন্ত। এই দুই অত্যুজ্জ্বল আলোর চোখ ধাঁধানো ছটায়, পাদপ্রদীপের তলায় অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার মতো, লোকদৃষ্টির বাইরে অবহেলিত, বিস্মৃতির পথে অবলুপ্ত হ'তে চলেছেন একজন, যাঁর মহামানবত্বের দাবী নেই, দোষে গুণে যিনি সাধারণ মানুষের অনেকটা নাগালের মধ্যে, অথচ যাঁকে ছাড়া রামকৃষ্ণ কাব্য রূপায়ণ হয়তো কোনোদিনই সম্ভব হ'তো না। রামকৃষ্ণ-আলো মাথায় নিয়ে দিকে দিকে তার জ্যোতি ছড়িয়েছেন বিবেকানন্দ। তাঁকে যদি বলি লাইটহাউস্, তাহ'লে যে কঠিন অথচ স্বচ্ছ আবরণ এই আলোকে বুক দিয়ে সযত্নে রক্ষা করেছে বাইরের শত ঝঞ্ঝা থেকে, তার সাথে তুলনা করতে হয় মথুরানাথ বিশ্বাসের।

কিন্তু ছুৎ-মার্গী মন আমাদের খুঁত খুঁত করে। মথুরানাথ বিলাস-ব্যসনাসক্ত, মথুরানাথ অত্যাচারী জমিদার, মথুরানাথ অনিন্দ্য-চরিত্র নন। তাই, রামকৃষ্ণ মহিমা কীর্তনে তাঁর ছোঁয়াচ, যতটা সম্ভব, বাঁচিয়ে চলা দরকার, পাছে, ঐ কলঙ্কের দাগ ঠাকুরের গায়ে লাগে। নেহাৎ রামকৃষ্ণ জীবনী রচনায় তাঁর অনুল্লেখ সম্ভব নয়, তাই, রসদদার হিসাবে কোনো রকমে তাঁর পরিচয় দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে তাঁর ইষ্টদর্শন হয়েছিল, এটা ঠাকুরের মুখ থেকেই শোনা গেছে বটে, তবে এই অহৈতুকী কৃপার কারণও তো ঠাকুরই নিজে মুখে বলে গেছেন: মথুর কি আর সাধে এত যত্ন আত্তি করত? মা এই যোগটার মধ্যে তাকে অনেক কিছু দেখিয়েছিলেন। সুতরাং মথুরানাথ যে ঠাকুরের রসদ-দার নির্বাচিত হয়েছিলেন এই তাঁর পরম ভাগ্য। তাঁকে নিয়ে আর বিস্তৃত আলোচনার দরকার নেই।

মহাপুরুষ-উক্তি বোঝা সহজ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁকে 'বকলমা' দেওয়ার কথা বলেছিলেন, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন গিরীশচন্দ্র, ভেবেছিলেন—বাঁচলাম। পরে টের পেয়েছিলেন ঐ আপাতসহজ 'বকলমা' কথাটি কতো কঠিন। রামকৃষ্ণদেব হয়তো মথুরের উল্লেখ করে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন: "মথুর আমার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিল। তোমরা চেষ্টা করলে তোমরাও পারবে। আমাকে যে মানুষটি দেখছ, আমি শুধু সেই রক্তমাংসের মানুষটি-ই নই। আমার স্বরূপ সত্তা অনেক বড়ো।" মথুর যাকে তাঁকে যত্ন করে, সেই জন্যেই মা তাকে অমন দেখিয়েছিলেন—' রামকৃষ্ণদেবের কথার এই অর্থ নিশ্চয়ই ছিল না। সাধারণ সাধকের সম্মোহন বিদ্যাপ্রয়োগে বশীকরণের মতো, অলৌকিক দর্শন করিয়ে নিজের রসদ-দার যোগাড় করা, বা তাঁর নিজের আকর্ষণ বজায় রাখার মতো হীন বুদ্ধি ঐ দেবসদৃশ পুরুষের থাকতেই পারে না।

রামকৃষ্ণদেহে নিজ ইষ্ট দর্শনে, মথুরানাথের যে তাঁর উপরে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বেড়ে গিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্তরের প্রস্তুতি কি তাঁর আগে থেকেই ছিল না? কি ছিল সেদিন সেই উনিশ বছরের গেঁয়ো, আধ-পাগলা ছেলেটি, যেদিন তাঁর দাদা তাঁকে হাত ধরে

আনলেন গ্রাম থেকে কলকাতায়, আখেরের বন্দোবস্ত করতে? কে পাত্তা দিয়েছিল সেই অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তানকে চালকলা যোগাড়ের বিদ্যাও ছিল না যাঁর ভাঁড়ারে? অথচ তাঁকে দেখেই মথুরানাথের —এবং একমাত্র মথুরানাথেরই—মনে হলো, 'এই সেই আধার, যিনি পারেন পাষাণ প্রতিমায় প্রাণ সঞ্চার করতে।' এ অন্তর্দৃষ্টি কি সহজ তপস্যার ফল? এ সেই অন্তর্দৃষ্টি, যার বলে তিনি ধরতে পেরেছিলেন রামকৃষ্ণদেবের প্রকৃত অবস্থা, যখন মহিম স্তোত্র পড়তে গিয়ে তিনি শিবের কাঁধে চড়ে বসেছিলেন, শ্যামা মাকে ভোগ নিবেদন করতে গিয়ে ভোগ তুলে দিয়েছিলেন নিজের-ই মুখে, বুঝেছিলেন, ভাবমুখে ভক্ত ও ভগবান এক হয়ে গেছেন, বাঘের মতো দাঁড়িয়ে থেকে রক্ষা করেছিলেন ভাবোন্মাদ সাধককে তথাকথিত পণ্ডিত ও আচার-বিচার-ধর্মী শাস্ত্রের ধ্বজাধারীদের অত্যাচার থেকে।

'কৃপা অহৈতুকী', এ কথাটি বৈষ্ণবীয় বিনয়ের। যিনি কৃপা লাভ করেন তাঁর অহং বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে যায়। তাই তাঁর মনে হয়, যে কৃপা পেলাম আমি তার যোগ্য নই। সত্যিই যদি কৃপা অহৈতুকী হতো, তাহলে ভগবান পক্ষপাতদুষ্ট হতেন, কৃপার যোগ্য হলে তবেই কৃপালাভ সম্ভব। যদি বলা যায়, কৃপার বাতাস সব সময়ই বইছে, তাহলেও সে কৃপার সাহায্য পেতে, পাল তুলে দিতে হয়। মথুরানাথের নৌকায় নিশ্চয় সে পাল তোলা ছিল।

বিষয়ীর ছায়া পর্যন্ত যাঁর সহ্য হয় না, সেই ঠাকুর দীর্ঘ এক যুগ কাটিয়ে দিলেন এমন একজনের আশ্রয়ে, জমিদারীর প্রয়োজনে যাঁকে নরহত্যা পর্যন্ত করাতে হয়। কাম-কাঞ্চন-ভোগীর স্পর্শে যাঁর দেহে জ্বালা ধরে যেত, তিনি কিনা মথুরানাথের মতো কামী পুরুষের সাথে কাটালেন দিনের পর দিন শুধু একই ঘরে নয়, অনেক সময় এক শয্যায়ও। স্বামী-চরিত্রে সন্দিহান জগদম্বা রামকৃষ্ণদেবকে পাঠালেন স্বামীর সাথে পাহারা হিসাবে তার সান্ধ্য ভ্রমণকালে। মথুরানাথ দিব্যি তাঁকে নিয়ে যথা স্থানে গেলেন, বসিয়ে রাখলেন তাঁকে নীচের এক কুঠরিতে, আবার খানিক বাদে নেমে এসে তাঁকে নিয়ে ফিরলেন বাড়িতে। অথচ এহেন ব্যক্তির সাথে একই পাঁচনে ফিরতে রামকৃষ্ণদেবের গায়ে ফোস্কা পড়ল না। কি এর রহস্য? ঠাকুর কি আশ্রয় চ্যুতির ভয়ে চুপ করে ছিলেন, নাকি কামাকাঞ্চন-সেবীর স্পর্শে তাঁর যে দৈহিকবিকার পর্যন্ত দেখা দিত, সেটা নেহাৎ-ই ভাণ?

ঈশ্বর ভাবগ্রাহী। আধ্যাত্মিক জগতে দৈহিক আচরণের চেয়ে অনেক বড়ো, অন্তরের ভাব। গীতায় আছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

'অতি দুরাচারীও যদি অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করে, তাকে সাধু ব'লেই জানবে, কারণ তার সংকল্প অতি সাধু।'

পরিষ্কার বোঝা যায়, মথুরানাথ যত অনাচারী-ই হোন, তিনি সত্য-সংকল্প ছিলেন। মনকে চোখ ঠেরে, লোকচক্ষুর আড়ালে পাপে প্রবৃত্ত হ'য়ে লোকসমাজে সাধুর মুখোশ প'রে ঘুরে বেড়াবার মতো শঠতা তাঁর ছিল না। রামকৃষ্ণদেব যে স্বয়ং ঈশ্বর, এ বোধ তাঁর দৃঢ় ছিল। লোকচক্ষু এড়ানো যায়, ভগবানের চোখকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। 'তুমি জানো আমি কি। রাখতে হয় রাখো, মারতে হয় মারো, দরকার হয়, বদলে নাও'—বুঝতে কষ্ট হয় না, এই ছিল মথুরানাথের অন্তরের ভাব।

আর তাঁর এই অনন্য ভক্তিতেই বাঁধা পড়েছিলেন ঠাকুর।

অন্তরে যে ভক্ত, নিজের কল্যাণের দিকে সে কখনো তাকায় না। ইষ্টের সুখ-স্বচ্ছন্দ তার কাছে তার নিজের মঙ্গলামঙ্গলের চেয়ে অনেক বড়ো হ'য়ে দেখা দেয়। গোপিনীরা তাই কৃষ্ণ আরোগ্য লাভ করবেন জেনে তাঁর মস্তকে পদধূলি দিতে কুণ্ঠিতা হন নি। কুণ্ঠিত হন নি মথুরানাথও। তাঁর যখন মনে হ'লো, 'বাবার অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের ফলে হয়তো বাবার মাথা খারাপ হ'তে চলেছে, ব্রহ্মচর্য নষ্ট হ'লে হয়তো তিনি স্বাভাবিক হ'তে পারেন', তখন-ই বিনা দ্বিধায় তাঁকে নিয়ে গেলেন বেশ্যালয়ে। একবারও নিজের ভালো-মন্দের কথা ভাবলেন না, চিন্তাও করলেন না, অবতার সদৃশ মহাপুরুষের নৈতিক অধঃপতনের কারণ হ'লে তিনি নিজে সবংশে ধ্বংস হ'তে পারেন। এমন দুর্লভ ভাবের অধিকারী যিনি, দেহে মনে যিনি এমন সত্যনিষ্ঠ, শতবার পাঁকে ডুবলেও পাঁকাল মাছের মতোই তিনি থাকেন পাঁক মুক্ত। তাই তাঁর স্পর্শে কালুষ্যবোধ হয় নি পরমপুরুষের।

এমন ইঙ্গিতও করা হয় যে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকে মথুরানাথের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়, রাণী রাসমণির জমিদারীতে তিনিই হ'য়ে ওঠেন সর্বেসর্বা, আর তাই ঠাকুরের উপর তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি বেড়ে যায়। যারা অর্থলোভী তারা স্বভাবতঃই অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হয়, সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ যতই হোক না কেন। মথুরানাথের বেলায় কিন্তু দেখা যায় উল্টো। রামকৃষ্ণদেবের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় ক'রেছেন তিনি। মধুর ভাবের সাধনায় যখন রামকৃষ্ণদেব মগ্ন, কিনে দিয়েছেন মহামূল্য শাড়ী, অলঙ্কার, তীর্থ যাত্রায় তখনকার দিনে খরচ করেছেন পঁচাশী হাজার টাকা। একবার মাত্র তিনি প্রতিবাদ ক'রেছিলেন। কাশী যাবার পথে বৈদ্যনাথের কাছে বহু দুঃস্থ লোকের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থার জন্য যখন ধ'রে বসলেন ঠাকুর, মথুরানাথ ব'লে ফেলেছিলেন : 'বাবা, তুমি তো সংসারী লোক নও টাকার কদর বোঝো না। তীর্থ যাত্রায় অনেক টাকার দরকার।' কিন্তু যে-ই রামকৃষ্ণদেবের 'যা শালা, আমি তোর কাশী যাব না, এখানে এদের মাঝেই থাকব' বলে, বেঁকে ব'সলেন, অমনি ঠাকুরের ইচ্ছা পূরণে লেগে গেলেন। এর থেকে মথুরানাথের যে ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেকি কোনো অর্থলোলুপ হিসেবী লোকের, না এক স্নেহশীল পিতার, পরমপ্রিয় অবুঝ ছেলের সব আবদার যিনি মুখ বুজে সহ্য করছেন?

ঠাকুরের উপর তাঁর এই বাৎসল্য ভাবের পরিচয়ই পাই যখন দেখি, ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুতে বিষাদাচ্ছন্ন রামকৃষ্ণের মন ভালো করার উদ্দেশ্যে মথুরানাথ তাঁকে নিয়ে জমিদারী মহলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই প্রাণের টানেই তিনি গোপনে হাজির হ'য়েছিলেন পানিহাটির মহোৎসবে, যখন শুনেছিলেন, সেখানকার গোঁড়া বৈষ্ণবকুল ঠাকুরের প্রতি অন্যায় আচরণ করতে পারেন। তাই, জাগতিক লাভ তাঁর যা-ই হ'য়ে থাক রামকৃষ্ণদেবের সাহচর্যে, সন্দেহ থাকে না, মথুরানাথের প্রাণপাত সেবার আসল উৎস ছিল, ঠাকুরের উপর তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা-ই।

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় মথুরানাথের স্ত্রী জগদম্বা দুরারোগ্য ব্যাধিমুক্ত হয়েছিলেন, একথা সবাই জানে। এতে ঠাকুরের যে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ, তা-ই সকলকে আচ্ছন্ন করে। কেউ কিন্তু ভুলেও একবার ভাবেন না কেন এমন হলো? রামকৃষ্ণদেব কি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে ডাক্তারী করতে বসেছিলেন? যতদূর জানা যায়, তিনি এ জাতীয় সিদ্ধাইকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন, যথাসম্ভব

সচেতন থাকতেন, যাতে তাঁর আত্মিক শক্তির কোনো অলৌকিক প্রকাশ না হয়। মথুরানাথের বেলায় তার ব্যতিক্রম হ'লো কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে মথুরানাথেরই মনোভঙ্গীতে। নিজের কথা ভেবে যদি তিনি স্ত্রীর আরোগ্য কামনা করতেন তাহ'লে এ অঘটন ঘটত না নিশ্চয়ই। জগদম্বা মারা গেলে তাঁর নিজের যা হবার তা তো হবেই। সে জন্যে কাতর নন তিনি। কিন্তু স্ত্রী না থাকলে শ্বশুরের সম্পত্তির উপর কোনো আধিপত্য-ই থাকবে না এবং তার ফলে এতদিন যেমন মনের সাধে ঠাকুরের সেবা-পরিচর্যা করে আসছিলেন তা আর তাঁর দ্বারা করা সম্ভব হবে না। এই ভাবনাই বিচলিত করেছিল তাঁকে, আর সেই মনোবেদনাই তিনি নিবেদন করেছিলেন তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে। সেবকের এই দীন আকুতি-ই ঘটিয়েছিল ঐশ্বরিক শক্তির অবতরণ সেই ঠাকুরেরই মাধ্যমে, রোগসারানো সিদ্ধাই ছিল যাঁর দুচোখের বিষ।

শালগ্রামশিলা দিয়ে মশলা পেষা হয়তো যায় কিন্তু উচিৎ নয় এ বোধ যে মথুরানাথের বিলক্ষণ ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় ছোট্ট একটি ঘটনায়। মথুরানাথ ফোঁড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন। ক'দিন ঠাকুরের কাছে যেতে পারেন নি, তাই, খবর পাঠিয়েছেন ঠাকুরের কাছে, দর্শন দিতে। রামকৃষ্ণদেব এলেন মথুরানাথ তাঁর পদধূলি চাইলেন। ঠাকুর বললেন; আমার পায়ের ধুলো দিয়ে কি হবে? তাতে কি তোমার ফোঁড়া সারবে? মথুরানাথ হেসে বললেন; "বাবা আমি কি এমন-ই? তোমার পায়ের ধুলো কি ফোঁড়া আরাম করিবার জন্য চাহিতেছি? তাহার জন্য তো ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হইবার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধুলা চাহিতেছি।"

এই মথুরানাথ—ভক্তি পথের অর্জুন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নিয়ে অনেক আলোচনা; অনেক লেখা হ'য়েছে, হচ্ছে, হবে, হওয়া উচিৎও, কিন্তু সেই সাথে অন্ততঃ একবারও যেন আমরা স্মরণ করি সেই মানুষটিকে, যাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছিল যুগাবতারকে, পিতার স্নেহে, দাসের সেবায় যিনি ঘিরে রেখেছিলেন তাঁর পরমারাধ্যকে, ভোগত্যাগের জোড়া ঘোড়া যিনি বলিষ্ঠ হাতে একসাথে ছুটিয়েছিলেন, নৈষ্ঠী শুদ্ধাচারী না হ'য়েও যিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠায় অকম্পহৃদয়, অব্যভিচারিণী ভক্তির জোরে অনায়াসে হয়েছিলেন সিদ্ধ, সাদা, খোলা চোখে পেয়েছিলেন নিজ ইষ্টের দর্শন,—রামকৃষ্ণকাব্যের উপেক্ষিত সেই মথুরানাথ বিশ্বাসকে।

তুরুক মেনিয়া সাথে ভারতের সুপ্রাচীন সম্পর্ক

সুধীন্দ্র কুমার

মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে ভয়াবহ করকুম মরুভূমির অন্তর্গত তুরুকমেনিস্তানেরই উত্তরের বিস্তীর্ণ অংশ। পূর্বেকার ইসলামী ভূমি। ইসলাম-পূর্ব ইতিহাস বিশেষত প্রাক্ ইতিহাস অতি প্রাচীন। বর্তমানে সোভিয়েত ভূমি। 'তুর্কমেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী রিপাব্লিক সুবিশাল সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত ও কেন্দ্রীয় শাসন নিয়ন্ত্রিত হলে স্বয়ংশাসিত সমাজবাদী সাম্যবাদী গণরাজ্য। ১৫টি অনুরূপ স্ব-রাজ্যেরই অন্যতম। যুগযুগান্তরবাহী জনকৃষ্টির ও সর্বপ্রধান ভাষার ভিত্তিতে প্রতিটি স্বয়ংক্রিয় গণরাজ্য গঠিত। কাজাখ, উজবেক, তাজিক, কিরঘিজদের সোভিয়েত-পূর্ব ইসলাম ভূমির বহুকাল পরে স্ব স্ব এলাকায় তুরুকমেনদেরই মত স্বশাসিত রাজ্যগুলিও একই ভিত্তিতে। তারই প্রতিবেশী কাশ্‌পিয়ান্ সাগরের পূর্বতীরে, উত্তরে ও পূর্ব-দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে। পশ্চিমতীরে ককেশাশ জর্জীয়া, আর্যবজনের আসর্বাইজান ও তারই পাশে আরমেনিয়া অরমেনিয়া বা অরমীনিয়া। এই সবগুলি রাজ্যই ভারতীয় কৃষ্টির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। স্মরণাতীতকাল হতে। কিন্তু তা অন্য প্রশ্ন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় কৃষ্ণ-কাশ্‌পিয়ান্ সাগরের মধ্যস্থ ও আযত্ত বা আর্যব সাগরের (বর্তমানে উপসাগরও নয় হ্রদে পরিণত) দক্ষিণে এইসব রাজ্যগুলি। আরল বা অরল সাগরের চারপাশে তুরুকমেনিয়া সহ (পশ্চিমে) চারটি উল্লিখিত সোভিয়েত রাজ্য। ভারত আফগানিস্তান গান্ধার বেলুচিস্তানেরই উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তরে। কাশপিয়ানের ককেশাশ পর্বতের পশ্চিমে তাউরস বা তাইরস পর্বতেরও উত্তর-পশ্চিমে জর্জিয়া, আযরবাইজান আরমেনিয়াই নয় বর্তমান তুরুকিও। সবকটি ভূমিই এশিয়ামাইনরের। খৃ.পূ. তিন সহস্রক হতে দুই সহস্রক ও তারও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক খাত্তি খেত ক্ষিতি ক্ষত্রভূমি। আজ প্রমাণিত সত্য খাত্তিদের সুপ্রাচীন ইতিহাস। প্রাচীন ভারতের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বহু 'জনে'রও কৃষ্টি এই সব ভূভাগের অনেক অঞ্চলেরই। কিন্তু সে সবও অন্য প্রশ্ন। তুরুকমেনিয়ার সহিত কৃষ্টির একই আদি ধারাবাহী বহুধারে। বিশেষত তুরুকমেনিয়া। তাই তার নামমাত্র উল্লেখ। একই যুক্ত ধারারই অন্য রাজ্যগুলিরও। প্রাচীন ক্ষাত্তিভূমি তুরুকির প্রাক্ ইতিহাস ভূগর্ভখোদিত প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষাত তাম্রপ্রস্তর কাল খৃ.পূ. ৪২০০ বছর অতিক্রম করে গেছে। শেষ প্রস্তরযুগ ও বিভিন্ন পাত্রের বহুবর্ণা কৃষ্টি ৬০০০ বছর ছাড়িয়ে ৮০০০ বছরেরও কাছাকাছি। ভারতের ও আফগানিস্তানের কাশ্মীর বদাক্ষণের বাণিস কুঠার কৃষ্টি ও নিয়োলিথিক এবং 'লাপিস লাজুলি' জেল নীলমণির কৃষ্টি ৪২০০ বছর ছাড়িয়ে ৮০০ খৃ.পূ. কালে পৌছেছে রেডিয়োকার্বন নিরূপিত তারিখগুলি অনুসারে। গান্ধারের 'ঘোর ও সরে' অঞ্চলের সপ্তগুহার কৃষ্টি খৃ. পূ. ৫০৮০ হতে ৬৭০০তে পৌছেছে। ঋগ্বেদের বহু সূক্তের রচয়িতা সর্পঋষি ঋষিকারাও। নাগ সর্প মাতা কদ্রু পুত্র কন্যার বংশধররা। বেলুচিস্তানের লসবেল বসতির কদ্রুরই নামাঙ্কিত কুদ নদীর তীরে প্রসিদ্ধ গন্ধরাণীগুহা গন্ধর্বরাণীরই নামে। লসবেলার রেডিয়োকার্বন তারিখ খৃ. পূ. ৫৪৯১ বছর। গন্ধর্বরাজ ত্বষ্ঠা ঋগ্বেদ কালেই রুদেব প্রজাপতি দক্ষেরূপান্তরিত। অদিতি দাক্ষায়নীতে। ত্বষ্ঠারি ঘরণী। ইন্দ্রেরও জননী।

তুরকমেনিয়ার পশ্চিমে ইম্পাকু ইক্ষাকু অক্ষুভূমি ইরান আইর্যানা এবং ইউফ্রেতিস তাইগ্রিশ নদীধৌত সুপ্রাচীন সুমেরু ব্যবিলন আসিরিয়া ভূমি। বর্তমানে ইরাক জর্দান সিরিয়া লেবানন ঈশ্রাইল নামধারী স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির খণ্ড খণ্ড ভূভাগ। কাস্‌পিয়ান সাগর ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে এশিয়া মাইনর তুরুকিস্থান তুরস্ক। কাশপিয়ান সাগরের চার পাশে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, হিন্দুকুশ সিন্ধু কারাকুরাম পামিরের দুই পারে সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলির উদয় ও অস্তভূমি। উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিমভারত জুড়ে মহেঞ্জোদরো চহ্নুদারো লোদাল হরাপ্পা রূপারের সুপ্রাচীন সভ্যতারও তুঙ্গ অভ্যুদয় এবং আকস্মিক বিলয়। এখানে ওখানে তারি ধ্বংসাবশেষ। আজো নানাস্থানে কতনা প্রাচীন ঐশ্বর্য মাটির তলে প্রোথিত হয়ে নবনব আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে। এই সব অঞ্চলেই প্রতি বছর খনিত কৃষ্টির বিচিত্র উপকরণ ভূগর্ভ হতে উত্থিত প্রাচীন জনপদ নগরী জগতের প্রাক ঐতিহাসিক রূপরেখা পরিবর্তিত করে চলেছে। এই সব এলাকা দেখলে তারি কথা মনে রং ধরায়। তারি মাঝে বর্তমান মহাআনবিক যুগের বিকাশ ধন্দ্ব রক্তাক্ত সংগ্রাম ও নতুন সৃষ্টির প্রয়াস। তুরুকমেনিয়ার ভৌগোলিক ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক পরিস্থিতি তুরুকমেনিয়ার করকুম মরুভূমি প্রধান নদ নদী উপসাগর জনপদগুলির অবিস্মৃত নামাবলীর সাথেই নয় তুরুকমেনিয়ার নামেরই সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে সুপ্রাচীন প্রাক ইতিহাসের অনেক বিস্মৃত পদচিহ্ন। বিচিত্র পুরাণ কাহিনী। ভারতীয় কৃষ্টির সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কের নানা ইতিহাস। এই সব এলাকা দেখলে ও নামগুলির তাৎপর্যের সঙ্গে এই অঞ্চলের ও তার চার পাশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও প্রাক্ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কথা অনুধাবন করলে ইতিহাসের বিস্মৃত ও অর্দ্ধবিস্মৃত পথের কিছু সন্ধান মিলে। গুপ্ত বা সুপ্ত প্রাক্ ঐতিহাসিক খনিরও।

প্রথমে তুরুকমেনিয়া নামেরই অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা করা যাক। বহুকাল পরবর্ত্তী ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে সংমিশ্রিত তুরুকি, তুরুকিস্থান, সোভিয়েত তুরুকমেনিয়া। তারই কথা পড়তে ও শুনতেই আমরা অভ্যস্ত। অনেক ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ব বিদেরও এর অতীত কৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ধারণা নেই। থাকলেও অতিক্ষীণ। তাই অনেকেই হয়তো চমকে যাবেন যদি বলি তুরদেরই নামাঙ্কিত এই স্থানগুলির জনসমষ্টির আদি উৎস ভারতেরই এক প্রাচীন জনগোষ্ঠি। ঋগ্বেদে সার নাম তুর্বশ। পৌরাণিক নাম তুর্বস্থ। যদুজনের সঙ্গে তুর্বশ গোষ্ঠির জন যুদ্ধ ও শান্তির কালে বহু ঋক গানে যুক্ত হয়ে আছে অবিছিন্ন 'যদুতুর্বশ' নামে। প্রাচীনতর কালে। বিচ্ছেদ ঘটেছে পরে। যখন তুর্বশরা গেছে ভারতের বাহিরে। দ্রুহ্যরাও। যদুবংশ ক্রমে স্থায়ী হয়েছে ভারতে মহাভারতের মহাপ্রস্থান কাল পর্যন্ত।

ঋগ্বেদের বিভিন্ন প্রাচীন সূক্তে ও শতশত ঋকে সমসাময়িক কালের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার দ্রষ্টা ও অংশগ্রাহী বহু প্রাচীনতম ও প্রাচীনতর ঋকরচয়িতাদের সাক্ষ্যে এবং তাঁদেরই কাছ হ'তে শ্রুত সংহিতাকারদের শুধু শ্রুতই নয় তাঁদেরও নিজ নিজ কালে দৃষ্ট ঘটনাগুলির বর্ণনা হতে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্পষ্ট ও নিরূপিত হয়। এই তথ্য গুলি অতীব বাস্তব ও সুদূর প্রসারী অর্থপূর্ণ। আদি ভারতের বিভিন্ন কালের জন সমাজের ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রাখে। তথ্যগুলির সম্যক পর্যালোচনার স্থান এ নয়। শুধু সোভিয়েত তুরুকিস্থান বা তুরুকমেনিয়া ও তুরুকিস্থানের সহিত প্রাচীন ভারতের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বোঝাতে কয়েকটি তথ্যের স্পষ্টিকরণ দরকার। তুরুকিস্থান কি তুর্বশ

তুর্বশ-তুর্বান-তুরান তুরদেরি দেশ নামটির আদি উৎস ও তার রূপান্তরের একটু বিশ্লেষণ করলেই তার ক্রম পরিবর্তিত রূপের ধারাটি বেশ দেখা যায়। তুর্বশ হতে স্পষ্টই পালেস্তাইনের 'তুর্বষু'—তুর্বষু। পৌরাণিক তুর্বস্তু। ঋগ্বেদের 'তুর্বযানম' তুর্বীতি তুরা, তুর, তুরান। তুর্বীতি অবেস্তার 'তৌর্বেতি'। ঋগ্বেদের সূক্তে সূক্তে বহু ঋকে ইন্দ্র পূর্বকালে তুর্বীতিকে সাহায্য করেছেন নানাভাবে। তুর্বীতির সঙ্গে মান্ধাতার পুত্র পুরু কুৎসকে, আর্জুনেয়কে এবং বিশেষত দভীতি ও ইন্দ্র ভূতিকে। একটি ঋকে অতিসুপ্রাচীন বৃহস্পতি পুত্র ভরদ্বাজ দভীতি ইধ্মভৃতিকে পকৃথদের যুগ্ম অর্কবা সূর্য বলে গৌরব দিয়েছেন। পকৃথরা পাঠানদেরই পূর্ব পুরুষ এক'জন' গোষ্ঠি। ঋ, বে, ৬/২০।১৩।

ষষ্ঠ মণ্ডলের একই বিংশতি সূক্তে ইন্দ্রের অনেক কীর্তি কাহিনীর বর্ণনা দেওয়ার সঙ্গে এরই আগের ১২ ঋকে ভরদ্বাজ ইন্দ্রকে 'ধুনিমতী ধুনি' বলে সম্বোধন করে তুর্বশ ও যদুদের সমুদ্র পার হতে আনয়ন করার কথা বলেছেন। মরুৎ ও যুগ্ম অশ্বিনীর ('অশ্বিনৌ') সহযোগে-যদুতুর্বশদের সুদূর হতে সমুদ্র ও নদনদী পার করে ভারতে আনয়নের কাহিনী গৌতম বামদেব ভৌম তাত্রি, ভার্গব শৌনক (পরে আদিরস শৌনহোত্র) প্রভৃতি ইন্দ্রের সমসাময়িক সুপ্রাচীন ঋষিরাও তারই সমর্থন করেছেন। মৈত্রাবরুণি অগস্ত্য এবং অপ্সু বিবস্বন পুত্র মনুও। ধুনিদেরও এইভাবে পার করিয়ে আনানো হয়েছে প্রাচীনতর কালে। দুইবীর যুবা তুগ্র ও ভুজ্যুৎকেও।

ধুনিদের সঙ্গে চুমুরিদের একত্রে ধুনিচুমুরি বলে উল্লেখ। চুমুরি চম চাম চম্বা গন্ধর্ব কিন্নর গিন্নর গান্ধর্বী অপ্সরি কিন্নরীদেরই-বিভিন্ন গোষ্ঠি। ধুনিরাও। হিমালয় হিন্দুকুশ করকুরুমের দুই পারেই অতি প্রাচীন কাল হতে। প্রাচীনতম ও প্রাচীনতর জনগোষ্ঠিদের যক্ষ নাগ সর্পেরাও। চম্বসুত গন্ধর্ব ত্বষ্টা ইন্দ্রের জনক ও ইন্দ্র চুমুরিদের অদিতির কানীন পুত্র। জন্মমাত্রেই সোমপত্রে ভরা এক গিরিগুহায় বর্জিত। তথাকথিত আর্যও অনার্যের এক আদি জননী ও পিতৃপুরুষ অদিতি ও ত্বষ্টা এক আদিমাতা অহিগোপা অপ্সরী তাপ সেই গিরিগর্ভ হতে গুপ্ত বিল মধ্যে পতিত শিশু ইন্দ্রেরই পালিকা মাতা। তাঁরই কন্যা যমযমী আশ্বিনীদ্বয় যুগ্মযমজের জননী অপ্সরী অপ্যা সরন্যু বর্ণাশ্রমের বিধানদাতা মনুরও জননী। গন্ধর্ব অপ্সুই জনক। আর এক আদি জননী 'যূথমাতা' ইন্দ্র ও তার কন্যা অপ্সরী উর্বশী উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দুই প্রখ্যাত ঋগ্বেদী ঋষি বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের—যমজ জননী। এদের প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে দেবতা ও মানুষরূপে স্বতন্ত্র রূপকথা, কাহিনী ও ইতিহাস আছে। প্রাচীন জগতের নানা স্থানের ভূগর্ভ হতে উত্থিত তথ্যগুলি এসবের উপর ইতিহাসের নতুন আলোকপাত করেছে। প্রত্যেকটি বিষয় স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে।

ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্তগুলির বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত হয় তুর্বশ তুর্বযান তুরান তুরাতুর হতেই তুরকি শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে আদিম তুর্বশ শব্দটিরই ক্রম রূপান্তরে। সপ্তর্ষিদের অন্যতম ভূমি পুত্র অত্রি ইন্দ্রবন্ধু মরুতকে তুরদেরই জন বা গণ বলেছেন। বর্ম ও শিরস্ত্রাণধারী মরুৎগণ ইন্দ্রের বিভিন্ন যুদ্ধে প্রধান সহায় ছিলেন। ইন্দ্রের যেমন বজ্র মরুতদের তেমনি অনীক অর্থাৎ মিত্র বাহিনী। 'মরুতঃ' মরুৎগণ, 'মরুত্ত' পশ্চিম এশিয়ার সুমেরু বাবিলন আসিরিয়ার, আইর্যানা গুলিয়ানা আর্মেনিয়া আনাতোলিয়ার, ঋক-পূর্ব ও ঋকবেদী ভারতের এক সুপ্রাচীন দেবতা এবং তারই নামে নামী জনগণ ও তাদের এক সুবিশ্রুত নায়ক মরুত বা মরুত্ত। মরুৎগণ বলে প্রসিদ্ধ। আরব মরুভূমি হতে

তুর্কিস্থানের, তুর্কিমেনিয়ার ভয়াবহ কারাকোরাম বা করকুরুম মরুভূমিরই যেন দেবতা ও জনগণ।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের প্রথম দিকের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের এক সুমেরীয় লিপিতে মরুতের নাম 'মরুতু' বলে লিখিত। বাবলনীয় লিপিতে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের আক্কাদীয় ভাষায় রূপান্তরিত শব্দটি হলো 'অমুরুরু'। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের 'ইল তামরণ' বা 'তামর্ণ' লিপিতে সিরিয়ার এক প্রাচীন জেলাকে, বর্তমান লেবানন ও তার কাছের কিছু অঞ্চলকে বলা হয়েছে 'অমুরি'। পশ্চিম এশিয়ার অমরদের সুপ্রসিদ্ধ বাবিলন সম্রাট অমর 'হাম্মরবি' বা 'সাম্মরবি'র কুলদেবতা রণদেব এই মরুতু। ঋগ্বেদের রণদেবতা ও গণনায়ক 'মরুতঃ'। তাই শুধু নয়। ঋগ্বেদেও এই অমরদেরই নাম হয়েছে 'অমুর' (অমুরা) 'অমুরু'। ইন্দ্রকেও 'অমুরু বীর' বলা হয়েছে এক প্রাচীন ঋকে। বৃহস্পতি পুত্র শংযু বলেছেন ইন্দ্রকে ষষ্ঠ মণ্ডলের ১৭ ঋকে। এই সূক্তেরই প্রথম ঋকেই শংযু বলছেন: 'যিনি বহু দূর হতে তুবর্শ যদুদের ভালোভাবে এনেছেন সেই ইন্দ্রই আমাদের 'যুবা সখা'। ইন্দ্রকে পুরুদেরও 'পুরুতম' বলা হয়েছে এরি ২৯ ঋকে। এই (৪৫) সূক্তেরই শেষ তিনটি ঋকে পণীদের অধিপতি বৃবু ও তক্ষেরো সহস্র দানের স্তুতিবাদ করেছেন 'বৃবুং সহস্র দাতমমং সুরিং' বলে। পণীরা তখনো 'সুরি' সুরদেরি অন্তর্ভুক্ত। অথচ পরে পণীরা হয়েছেন অসুর। ইন্দ্রদূতী সরমার সঙ্গে 'পণয়োহসুরাঃ' অসুর পণীরাও ঋগ্বেদেরি এক সূক্তের যুক্ত রচয়িতা। এই সূক্তটিও গভীর অর্থপূর্ণ এবং ঋগ্বেদ পূর্ব ও ঋগ্বেদ কালীন মহাযোদ্ধা ইন্দ্রেরই নেতৃত্বে আদিকালে অসুর পণীদের সঙ্গে যুদ্ধের সূচক। অসুর পণীদের ঐশ্বর্য ভরা পুরী ও তাদের বিপুল ধনরত্ন অশ্বগোধনপূর্ণ গুপ্ত পর্বত গুহা আক্রমণের প্রথম চক্রান্তের অতি বাস্তব ও জলন্ত বর্ণনা। আর সেই বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শী সরমা। ইন্দ্র বৃহস্পতি অঙ্গিরার গুপ্ত দূতী। বহু দূর হতে 'রসা' নদী অতিক্রম করে পণীদের পুরে এসে এবং সরল বিশ্বাসী পণীদের আতিথেয়তার আদর আপ্যায়নের সুযোগ নিয়ে তাদের ধনরত্ন গুপ্ত গুহাদ্বার প্রভৃতি দেখে ইন্দ্র বৃহস্পতি অঙ্গিরাকে সেই অমূল্য সংবাদ দান। পরে ইন্দ্র পরিচালিত এক সংযুক্ত সৈন্যদলকে ভারতের বাহির হতে আনয়ন গুপ্ত পথ দেখিয়ে—এবং অতর্কিত আক্রমণ ও গুপ্তদ্বার পথে গুহা লুণ্ঠন। পণীদেরি এক প্রসিদ্ধ নায়ক বলের গুহা ও ইন্দ্রের যুদ্ধ। তার বর্ণনা ঋগ্বেদের বহু সূক্তে।

ইন্দ্র শুধু ক্ষাত্তি মিতান্নি 'আর্যানার্যের' দেবতাই নয় একজন রক্ত-মাংসের মানুষও ছিলেন। মহাশূর মহাবিজেতা মহাদানী নৃশংস ও ক্রূর কর্মা। এই ধুনি চুমুরি চাম গন্ধর্ব কিন্নরদের মধ্য হতেই জন্মেছিলেন। সিন্ধু হিমাচল বিন্ধ্যেরও দুই ধারে দেশে বিদেশে ঘুরেছিলেন। গন্ধর্ব কিন্নরদেরই সঙ্গে নয় তথাকথিত দেবদানব দৈত্য অসুর 'আর্য' অনার্যদের সঙ্গে অবিশ্রান্ত লড়েছিলেন। ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্তে সূক্তে অসংখ্য ঋকে অথর্বাদি বেদেও তাঁর মানবীয় কীর্তি অকীর্তির কাহিনী জলন্ত ভাষায় বর্ণিত। প্রত্যক্ষ দ্রষ্টারাই যেন বলছেন। তাঁদের কাছ হতেই অন্য ঋষিরা শুনে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। কোন রূপকের আবরণে কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তার বাস্তব সত্যতা ঢাকবার নয়। প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাদের মধ্যে আছেন বৃহস্পতি ও অঙ্গিরা, অত্রি, ভৃগু, গৌতম, কামদেব, ভরদ্বাজ, মৈত্রাবরুণি বশিষ্ঠ অগস্ত্য, কশ্যপ, কাশ্যপ, গাথীন্ বিশ্বামিত্র, পজলন্তি জমদগ্নি। তাদের পুত্রপুত্রী। পৌত্র পৌত্রীদেরও কেউ কেউ। তবে লিখিত নয়। লিখতে তাঁরা তখনো জানতেন না। সবই শ্রুত ও স্মৃত। তাই তার নাম শ্রুতি ও স্মৃতি। তবু অত্যন্ত জীবন্ত। উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত।

রুচি বিকার

বাঙালীর গর্ব করবার আজ আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই, একথা সকলেই স্বীকার করেন আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিতে ভুল হয় না, আর কিছু না থাক বাঙালীর সংস্কৃতি আছে। কথাটা কিন্তু নেহাতই কথার কথা বলে মনে হয় কারণ একজন জাপানী বা ফরাসীর মধ্যে তার সাংস্কৃতিক প্রভাব যেরকম পরিস্ফুট আমাদের মধ্যে কি তাই? সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে বিশদ আলোচনা বারান্তরে করার ইচ্ছা রইল, বর্তমানে সাধারণভাবে ধরা যাক।

সংস্কৃতির সাধারণ রূপায়ণ নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানেই দেখা যায়। বাঙালীর সামাজিক সংস্কার অসংখ্য, তার মধ্যে প্রধান অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ আর শ্রাদ্ধ। এছাড়া ইদানীং কালের পশ্চিমী অনুসারী দু'টি উৎসবও বিচারের আওতায় আনা যায়—(১) জন্মদিন ও (২) বিবাহ বার্ষিকী। এই ক'টির প্রাচীন রূপ আর বর্তমান পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করলেই আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের গভীরতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যাবে। (নানাবিধ পূজার প্রসংগ ইচ্ছাকৃতভাবেই আপাততঃ মুলতুবী রাখছি কারণ প্রথমতঃ সে বিষয়ে বিচার বিবেচনা দীর্ঘ হতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক বিচারে কতকগুলি মানদণ্ড সৃষ্টি করে নিলে বিচার সহজতর হবে।)

আমাদের প্রায় সর্ববিধ সংস্কারের দু'টি দিক—(১) শাস্ত্রীয়, (২) লৌকিক। আজকের দিনে শাস্ত্রীয় সংস্কার প্রায়শঃ ক্ষীণ হয়ে এসেছে সুতরাং এ নিয়ে আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছু কিছু লৌকিক ক্রিয়াকলাপের সাংস্কৃতিক মূল্য অনস্বীকার্য। অথচ আজকের দিনে তার ওপর ঝোঁক কমে আসছে তা নিশ্চয় আমাদের সংস্কৃতির গৌরব বাড়াচ্ছে না।

আগের দিনে একমাত্র শ্রাদ্ধ ছাড়া অন্য সব অনুষ্ঠানে সানাই বা নহবত বসাবার রেওয়াজ ছিল। নহবতের সুর সম্পূর্ণ দেশজ বস্তু এবং তা এদেশের সংস্কৃতির গৌরবই প্রচার করতো। শ্রাদ্ধে ব্যবস্থা থাকতো কীর্তনের, সেটিও দেশজ সংস্কৃতির এক মূল্যবান উপহার। কিন্তু আজকের দিনে প্রায়শঃই ও দু'টিকে বাদ দিয়ে সরাসরি মাইকের পাইক চালানো হচ্ছে। বিদেশী সুরের ভিত্তিতে অদ্ভুত শব্দ সম্ভার সম্বলিত সে গান শুনলে খুন না চাপাটা বিস্ময়কর। অথচ আমরা সে হেন অপসংস্কৃতিকেই আঁকড়ে ধরছি।

আগের দিনে আল্পনা আর ফুল দিয়ে গৃহসজ্জার রীতিটাও উঠে যাচ্ছে, তার জায়গা নিচ্ছে বৈদ্যুতিক আলোর চমক। তাতে আর যাই থাক সংস্কৃতির নাম-গন্ধ পর্যন্ত নেই।

তারপর প্রথাগত বরণ বা আহ্বানের মধ্যেও সংস্কৃতির আভাস ছিল। আজ তা সম্পূর্ণ অপসৃত না হলেও বিদেশীয়ানার প্রকোপ তাকে ক্রমেই কোণঠাসা করে দিচ্ছে।

জন্মদিন পালন আগেও যে হতো না তা নয় তবে সেটা মূলতঃ ছিল প্রিয়জনের প্রীতি বা শ্রদ্ধা

মেশানো ভালবাসার প্রকাশ। আজকের দিনে প্রায়শঃই হৃদয়ের উত্তাপটা শীততাপ নিয়ন্ত্রণের দৌলতে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় না। আর তাই তারই সঙ্গে বিদায় নিতে চলেছে আমাদের আর এক বৈশিষ্ট্য বন্ধন-কলা। ঘরোয়া রান্নার যে সুষম শিল্প সম্মত রূপ স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বকালেও পাওয়া যেত আজ তা কাহিনী মাত্র। আজকে তার জায়গা নিয়েছে এমন কিছু খাদ্যবস্তু যা শৈল্পিকগুণসম্পন্ন তো নয়ই এমনকি ভিন্ন পরিবেশে সম্পূর্ণ বেমানান তথা অস্বাস্থ্যকর।

এর পরে আসে বেশবাসের কথা। আমাদের দেশীয় বেশবাসের মধ্যে যেমন সুরুচি ছিল তেমনি ছিল সৌন্দর্য বোধ। তাছাড়া সেসব বেশ আমাদের দেশের আবহাওয়া অনুসারী থাকায় আরামপ্রদও ছিল। কিন্তু বিদেশীয়ানার ধাক্কায় আজ যা অঙ্গে ধারণ করা হচ্ছে তাতে সুখও নেই আর রুচিও নেই।

বিবাহ বার্ষিকী বস্তুটিও খাঁটি বিদেশী। আমাদের দেশে যেহেতু বিবাহকে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার বলে বর্ণনা করা তাই তার আয়ুষ্কাল নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনই থাকতো না কারো। এখন বিদেশেও যতদিন অনুরূপ অবস্থা ছিল তখনও ঠিক একই ভাবে হিসাব নিকাশ অপ্রয়োজনীয় বোধ করা হতো। পঁচিশ বা পঞ্চাশ বছর পরে অবশ্য প্রায়শঃই নাতি-নাতিনীরা খেলাচ্ছলে দ্বিতীয়বার বিয়ের ব্যবস্থা করতো এবং তখনো প্রথম বিয়ের অনুরূপই সমস্ত ব্যবস্থা হতো। কিন্তু এখন বিচ্ছেদ সহজসাধ্য হওয়ায় বার্ষিকীপালন প্রায় আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ লোককে দেখানো, দেখ আমাদের এ বন্ধন কেমন মজবুত। এবং যেহেতু এ উৎসবের কোনো নজির বা ঐতিহ্য এদেশে গড়ে ওঠেনি তাই সম্পূর্ণ বিদেশীধরণ অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর কি?

কোনো কিছু যদি ভালো হয় তো তাকে অনুসরণ করাতে খারাপ কিছু নেই কিন্তু পুরোপুরি অনুকরণে আর যাই হোক সুরুচির প্রকাশ সম্ভব নয়। এখন যেহেতু আমরা অধিকাংশ লোকেই বিদেশী ঐতিহ্যের অংশীদার নই কাজেই আমাদের অনুকরণ অন্ধের হস্তীদর্শন হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। অথচ তার বদলে যা হারাতে হচ্ছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক অমূল্য সম্পদ। এই রুচি বিকারের হাত থেকে রেহাই পাই কি করে?

রবি মিত্র

পট

সমকালীন 'আষাঢ়' ১৩৮০ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু চক্রবর্তীর 'পট' শীর্ষক মনোজ্ঞ ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনাটি পড়লাম। পট প্রসঙ্গে scroll বা দীর্ঘপট শ্রেণীর চিত্রকলার সম্পর্কে—কিছু বক্তব্য অনুক্ত থেকে গেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সময়ে ১৭০০ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ইংলণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশে নানানসূত্রে ভারতবর্ষ থেকে পুথিপত্রের সঙ্গে নানাজাতীয় চিত্রপটের বিরাট একটি সংগ্রহ স্থানান্তরিত হয়। এই চিত্রকলার একটা প্রধান অঙ্গ হল scroll বা দীর্ঘপট। Oxford-এর All souls college এ Manchester এ John Rylands Library এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের Chestor Batty Libraryতে অন্যান্য অনেক মূল্যবান ভারতীয় পুঁথি পত্রের মধ্যে ৭৮টি মূল্যবান ও আকর্ষণীয় প্রাচীন দীর্ঘপট আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে Chestor Betty Library তে রক্ষিত ভাগবত পুরাণের বিষয় অবলম্বনে আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৫০০ শতকে রচিত এবং কাশ্মীর থেকে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত একটি দীর্ঘপট। এই পটটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭০ ফিট এবং প্রস্থে মাত্র ২ ইঞ্চি। অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের উপরে নানা বর্ণের দেশজ রং এর বিন্যাসে চিত্রিত এই পট। All Souls College-এর পটচিত্র দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০ ফিট এবং প্রস্থে দেড় ইঞ্চি। এটিও আনুমানিক সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে প্রস্তুত। Manchester John Rylands Library র পুঁথি সংগ্রহের মধ্যেও ১৮০ খৃষ্টাব্দের একটি ভাগবত পুরানের দীর্ঘপট আছে। এর শিল্পমন্ত্র অসামান্য। এই পটগুলির বিষয়বস্তু লৌকিক নয়; রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত পুরাণ, মার্কেণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের বিষয় অবলম্বনে রচিত। এদের জমিও কেবলমাত্র মসলিন থেকেই প্রস্তুত নয়। অনেক সময়ে সূক্ষ্ম গাছের ছাল দিয়ে তৈরী বা পশুর চামড়ার উপরের সাদা সূক্ষ্ম ত্বক্ বিছিন্ন করে একত্র সংযুক্ত করে বিশেষভাবে প্রস্তুত। তাই জমিকে হলুদবর্ণের কোন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে উজ্জ্বল ও মসৃণ করা হত। কাঁঠালের আঠাকেও কোন কোন ক্ষেত্রে উপকরণ রূপে ব্যবহার করা হত। জমিতে দেশীপটের মতন মেটে সিন্দুর, খড়িমাটি, হরিতাল, নীল এবং অন্যান্য নানা দেশজ শাকপত্রের নির্যাস ব্যবহার করা হত। প্রদীপের কালি থেকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ রং তৈরী হত। কয়েকটি পটের মধ্যে দেশজ তৈল ও উদ্ভিদের ঘ্রাণ আমরা পেয়েছি। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী পট্টচিত্রের উদ্ভবের কোন সময় নির্দেশ করতে পারেননি। কিন্তু এই চিত্র সম্পদ যে মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ববর্ত্তীতা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং বৌদ্ধ জাতক কাহিনীগুলিতে লেপ্যচিত্র, লেখ্যচিত্র এবং ধূলিচিত্র এই তিনধরণের চিত্রকলার উল্লেখ আছে। লেপ্যচিত্র সাধারণতঃ পট্টবস্ত্রের উপরেই অঙ্কিত হত। পরবর্তীকালের সাধারণ পট এবং দীর্ঘপট এই লেপ্যচিত্রের ধারারই পরিণতি। বর্তমানে scroll painting বলতে যে ধরণের চিত্রকলা আমরা দেখতে পাই তাতে মুসলমান শিল্পকলার

প্রভাব কিছু পরিমাণে দেখা যায়। আয়ার্ল্যাণ্ডের Chester Betty Library তে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে সূক্ষ্ম বস্ত্রের উপরে লেখা ২ ইঞ্চি চামড়া এবং প্রায় ৬০ ফিট দীর্ঘ একটি হাতে লেখা কোরাণ আছে। মনে হয় সে হস্তলিখিত কোরাণের ঐ বিশিষ্ট রচনা পদ্ধতির অনুকরণে সমসাময়িক বা পরবর্ত্তীকালে সূক্ষ্ম বৃক্ষত্বকের উপরে সোনালী দেবনাগরী ও কাশ্মীরী সারদা লিপিতে গীতা, চণ্ডী বা পুরানের এই সমস্ত দীর্ঘপটগুলি প্রস্তুত হয়। এই দীর্ঘপটগুলির চিত্রশ্রেণীতে কাড়া কুলু প্রভৃতি শিল্পরীতির প্রভাব মাঝে মাঝে দেখা গেলেও এদের বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার চিত্র শ্রেণীর নীচে ও পাশে দেবনাগরী বা কাশ্মীরী অক্ষরে ভাগবত পুরাণ বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের কাহিনী লিখিত দেখা যায়। এক একটি পটে ন্যূনপক্ষে অন্ততঃ ১০০টি চিত্র আছে। পটগুলিতে কুণ্ডলীকৃত করে মাত্র ১ ইঞ্চি ব্যাসের রূপার ছোট একটি আধারে রাখা যায়। এই সমস্ত পটে মুসলমানী চিত্রকলার ধাঁচে দুই পাশে নীল সোনালী বা সাদা রং এবং পুষ্পিত চিত্রাবলী অথবা দীর্ঘ সমান্তরাল রেখার ব্যবহার এ সমস্তই লক্ষ্য করা যায়। ভারতে মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্যের কোন কোন স্থান থেকে একদল ভাগ্যান্বেষী পুঁথি লেখক (calligraphist) ভারতে আসে। এদের মধ্যে অনেকেই চিত্রধর্মী অক্ষরবিন্যাসে এবং বিশিষ্ট মুসলমানী চিত্রাঙ্কনরীতিতে কোরাণ এবং অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ নকল করার কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখায়। তাদের এই বিশিষ্ট রচনারীতি হিন্দু পটুয়াদের প্রভাবিত করে। রাজ পৃষ্ঠপোষকতাও হিন্দু পটুয়াদের এই রীতি গ্রহণের অন্যতম কারণরূপে নির্দেশ করা যায়। রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতক, কাদম্বরী, হর্ষচরিত ও মুদ্রারাক্ষস এর কোনটিতেই লেপ্যপট বা পটের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কুণ্ডলাকার অতিদীর্ঘ পটের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর চিত্রের আয়তন বৈদেশিক প্রভাবে অথবা সূক্ষ্ম বস্ত্রের সহজ পরিবহণ যোগ্যতার জন্য সৃষ্ট হয়েছিল কিনা তা এখনও বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়। অন্যদিকে এই দীর্ঘপটগুলি হিন্দু মুসলিম ভাবধারার মিলনের অথবা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের নির্দেশক। মার্কণ্ডেয়পুরাণ বা বিষ্ণুপুরাণের দীর্ঘপটের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীগণ মুসলিম নবাব বাদশাহ এবং অন্তপুরিকারূপে সজ্জিত। ব্রহ্মাকে ককিরের রূপে বিষ্ণুকে দরবেশ রূপে দেখা যায় এমনকি অনেক ক্ষেত্রে রাজপুত যোদ্ধাদের মুসলমান পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখা যায়। খৃষ্টীয় চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে উত্তর ভারতের চিত্রকলায় হিন্দু মুসলমান ভাবধারা ও জীবনাদর্শের কিভাবে সমন্বয় হচ্ছিল তার কিছু প্রমাণ এই দীর্ঘ পটগুলির মধ্যে মেলে। আকবর এবং দারাশুকোর প্রভাবে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে যে ভাববিনিময়ের সূচনা হয়েছিল তারফলে হিন্দু পটুয়াগণ দীর্ঘপট রচনার এই বিশেষ আঙ্গিক গ্রহণ করেছিল এমন মনে করা বোধহয় বিশেষ অসঙ্গত হবে না।

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

দেশ পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে নানারকমের আলোচনা হয়। কিন্তু এসব আলোচনার বেশীর ভাগটাই পরোক্ষ চিন্তার ফল। কাজেই এটা প্রায়ই দেখা যায় যে যখন স্ব-আরোপিত সংজ্ঞা, কুটতর্কের রমরমা চলেছে চারদিকে তখন পশ্চিমবাংলার বাস্তবিক সাংস্কৃতিক উপাদান ও তার উদাহরণ বা নিদর্শনগুলিকে আমরা কেবলই উপেক্ষা করে চলেছি।

আজকে আমরা যদি জানতে চাই পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কত রকমের উনানের গড়ন আছে বা কত রকমের আকার ও গড়নের বাসনপত্র আমরা ব্যবহার করি তাহলে এখানকার কোন কোন খুব সংস্কৃতিবান ও দেশপ্রেমী মানুষও হকচকিয়ে যাবেন। তারপর আবার যদি পশ্চিমবঙ্গের ঘরামি, ক্ষেতমজুরেরা বা কারুশিল্পী ও আদিবাসীদের দৈননন্দিন ব্যবহারের হাতিয়ার, কর্মপদ্ধতি ও যন্ত্রাদি নিয়ে প্রশ্নতোলা যায় তাহলে হয় নিদারুণ অবজ্ঞা বা নিরতিশয় ক্রোধের স্রোতে সবকিছু তলিয়ে দেওয়া হবে। এটাই এখানকার সংস্কৃতিবানদের বহু ব্যবহৃত পদ্ধতি।

সত্যি কথা এটাই যে, আমরা যেন নিজের দেশেই বিদেশী হয়ে আছি। এর অবশ্য একটা কারণও আছে। লোকগণনা বিভাগের প্রতিবেদনের বিরাট গ্রন্থরাজির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে থাকা ও নৃতত্ত্ববিদ্যার কয়েকটি গ্রন্থে ছাড়া আমাদের দেশ সম্পর্কে এই প্রকৃতির তথ্য এক জায়গায় দেওয়া নেই। এই রকম একটা অবস্থায় আমরা আমাদের দেশের প্রাথমিক দ্রব্যাদির সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকছি। যন্ত্র শিল্পের অগ্রগতিতে, নতুন উপাদানের অদম্য প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ও বিজ্ঞাপন দিয়ে বিভ্রান্ত করে দেওয়া আজকের সমাজে একেবারে খাঁটি দেশীয় প্রথা ও পদ্ধতি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে আসছে।

এখানে বা এক্ষেত্রে একটা কাজ করার মত আছে। শ্রদ্ধেয় নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের উদ্‌যোগে ও প্রচেষ্টায় ভারতীয় নৃতত্ব-সমীক্ষা ও পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম-সংস্থান, কুটিরের গড়নরীতি, কৃষিযন্ত্রের প্রকৃতি, জামাকাপড় ও জুতার যে রকম সচিত্র ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক সেই রকমভাবে পশ্চিমবঙ্গের একটি সংহত ও চিত্রিত বিবরণের উপযোগীতা অপরিসীম। এতে এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের কুটিরও ঘরবাড়ী, গৃহ সংস্থান কৃষিযন্ত্র, খামার, গোলা, কাঠের, মাটির বা লোহার কাজের যন্ত্রাদি, যানবাহন ও নৌকা, মাছ ধরার জাল শিকারের দেশীয় সরঞ্জাম, হাঁড়ি কুঁড়ি বাসন-কোসন, গীতবাদ্যের যন্ত্র, সাজ পোষাক, পাখিরাখবার খাঁচা ও ফাঁদ, খেলনা-পুতুল এবং শিল্পকাজের পরিচয় দেওয়া দরকার। ছোট আকারের কিন্তু সুস্পষ্ট রেখাচিত্র দিলে সাধারণ কাগজেও বইটি ছাপা যাবে। এই রকম একটা পুস্তকে থাকা লিখিত বিবরণে যদি কেবল চিত্র নির্দেশনের ব্যবহারের এলাকা, পরিমাপ ও স্থানীয় নাম দেওয়া থাকে তাহলেই যথেষ্ট হবে। তবে সাধারণের বোঝবার জন্য যে সব জিনিষের ছবি দেওয়া হয়েছে তার ব্যবহার কিপ্রকার বা কারা ব্যবহার করেন—এ খবরটিও থাকলে ভাল হয়।

এই রকমের একটা একশত বা দুইশত পৃষ্ঠার পুস্তক প্রকাশিত হলে দেশের উপকার হবে। যেমন ভূগোল, সমাজবিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকে আমাদের ব্যবহারিক কৃষ্টির উপাদানকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করার কাজটি ভাল করে হবে। এছাড়া যদি গ্রন্থশেষে একটি বিভিন্ন স্থানীয় নক্সা ও অলঙ্করণের নমুনা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এটা ছাত্র, শিক্ষক

শিল্পী এরকম অনেকেরই কাজে লাগবে।

আমরা বড় বড় আকাশচুম্বী পরিকল্পনা করে করে ভীষণ পরিপক্ক হয়ে গেছি। কিন্তু এরকম একটা প্রচেষ্টায় অযথা কোন বড় পরিকল্পনাদির অন্তত: এখন কোন প্রয়োজন নেই। তথ্য ও চিত্র সংগ্রহের উদ্‌যোগ করে যদি কেউ পুস্তকাকারে প্রকাশকরার উদ্দেশ্য নিয়ে ধীরে ধীরে এই কাজটি করে চলেন তাহলে এই প্রকারের একটি 'সামান্য' কিন্তু বহুমূল্য গ্রন্থ রচিত হতে পারে। হয়ত প্রথম প্রচেষ্টায় সব কিছুই বৈজ্ঞানিকভাবে 'নিখুঁত' হবে না। কিছু ত্রুটি হয়ত থাকবে। কিন্তু খুঁত, ত্রুটি বা অনিচ্ছাকৃত ভুল প্রথম গ্রন্থটিতে থাকলেও পরে সেটা যোগ্যতর নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণে সংশোধিত হতে পারবে। কারণ অনেক সময়েই দেখা যায় যে প্রকাশিত গ্রন্থই অনেক বিষয়ে সুষ্ঠ আলোচনার সূত্রপাত করেছে এবং বৃহত্তর ও সম্পূর্ণতর প্রয়াস বা প্রচেষ্টাকে উৎসাহ জুগিয়েছে।

লোকসংস্কৃতি, নৃতত্ত্ববিদ্যা ও শিল্পকলার কর্মীরা যদি এই প্রকারের একটা প্রচেষ্টা করেন তাহলে সমগ্র দেশের একটা উপকার হয়। আমাদের ব্যবহার্য জিনিষেই আমাদের রুচি, জীবনযাত্রা, সৌন্দর্যবোধ ও মানসিকতা ধরা রয়েছে। প্রথাগত ও ঐতিহ্যবাহী ব্যবহার্য সব জিনিষই তাই আমাদের কাছে একটা বারবার খুঁজে দেখার মত সময় পরীক্ষিত উত্তরাধিকার। এটি উপেক্ষা করা চলে না। এটিকে অস্বীকার করলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন স্বকীয়তাহীন আবেগ দিয়ে খানিকটা চলে তারপর নিস্তেজ ও উদ্দেশ্যবিরহিত ব্যর্থতায় মগ্ন হয়ে যাবে।

যেসব গোষ্ঠী বা বিভাগ অথবা ব্যক্তিগত কর্মী এই কাজটির সম্পর্কে উৎসাহী তাঁদের কাছে এই আবেদনটি বিচারের জন্য উপস্থাপিত হল। বিদেশী মিশনারী ও ইউরোপীয় আগন্তুকেরা এইরকম কাজ স্বজ্ঞানে বা কেবল কৌতূহলের বশেও করে গেছেন গত শতাব্দীতে ও এই শতকের প্রথমদিকে। তাঁদের করা ভারতীয় জীবনের চিত্রিত বিবরণ আজ আমাদের ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে কাজে লাগছে। কাজেই আমরা সহজভাবে ও কোন আড়ম্বর না করে এরকম ধারায় একটা কাজে নামলে সেটি সফল হবার সম্ভবনা নিশ্চয়ই আছে।

সন্তোষকুমার বসু

সমালোচনা

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ : সুকুমার বসু ও সুহৃদ গোপাল দত্ত ॥ রূপা : কলকাতা—১২ ॥ মূল্য : বারোটাকা।

বেদ পুরাণ—উপনিষদের মন্ত্রপূত ভারতবর্ষে যত সাধু সন্ন্যাসী, যোগী ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের আর্বিভাব ঘটেছে, তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও হয় নি। বিশেষত বাংলার গাঙ্গেয় পলিমাটিতেই সোনার ফসলের মত সোনার গৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ যোগী-সমষ্টির হয়েছে আবির্ভাব। এদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে এক বিস্ময়। রুদ্রবাহী, স্বদেশসেবী সক্রিয় বিপ্লবী উত্তর জীবনে হয়েছেন নিষ্ক্রিয়, নিস্তব্ধ ধ্যানমগ্ন, আত্মসমাহিত যোগী। সাধারণ মানুষের কাছে শ্রীঅরবিন্দ এক অপার বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাঁর দ্বৈত-জীবনের পটভূমি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

'প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাকে জানিয়েছি—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"। আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগলভ স্তব্ধতায়, আজো তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"।'

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণকে শ্রীঅরবিন্দের প্রাকৃত ও দিব্যজীবনের প্রবেশ পথের সঠিক চাবিকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যাঁরা শ্রীঅরবিন্দ-জীবন দর্শনকে যাচাই করতে গেছেন, তাঁরাই অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব বিশ্লেষণের পথ ধরেই এগিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানী শ্রীসুকুমার বসু ও আইনজ্ঞ লেখক শ্রীসুহৃদ দত্ত এই জাতীয় বিশ্লেষণী দৃষ্টির আলোকেই শ্রীঅরবিন্দকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তীশতবার্ষিকীতে তাঁদের উভয়ের গভীর অনুধ্যান-অনুশীলনজাত লেখনীর সার্থক ফসল 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ'। মনোরাজ্যের মহারাজা-ধিরাজ শ্রীঅরবিন্দ। সেদিক থেকে গ্রন্থটির নামকরণের সার্থকতা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করে নেবেন।

'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থটির সূচীপত্র নিম্নরূপ—'আবির্ভাব' 'নৈষ্কর্ম্য এবং লোক-সংগ্রহ', যোগাশ্রমের একটি বছর', 'প্রাক্-পণ্ডিচেরী বৃত্তান্ত,' 'পণ্ডিচেরীতে উত্তরযোগী শ্রীঅরবিন্দ,' 'বিজ্ঞানময় পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ,' 'জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দের 'প্রারব্ধ' কর্মজীবন,' 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ'—এই কয়টি বিভাগে বিভাজন করে লেখকদ্বয় শ্রীঅরবিন্দ-অনুশীলনের পথ প্রশস্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'পরিশিষ্ট,' 'গ্রন্থপঞ্জী,' 'নামসূচী' দেখে ধারণা হয় লেখকদ্বয় বক্তব্য বিষয়সম্পর্কে যথেষ্ট যত্নবান এবং গবেষণাকার্যে একনিষ্ঠ।

পড়াশুনায় 'বাঘা' ছাত্র ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ও সুকঠিন

পরীক্ষা 'ক্লাসিকাল ট্রিপস্' প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় তিনি ছিলেন বিশেষ ব্যুৎপন্ন। কঠিন প্রতিযোগিতামূলক আই-সি-এস্ পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ একাদশ স্থান অধিকার করেন। ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার অশেষ গুণগ্রাহী-পিতা শ্রীকৃষ্ণধন ঘোষের আদেশে আই-সি এস পরীক্ষা দিলেও শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরী করার একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। আই-সি-এস পরীক্ষার অশ্বারোহণ বিদ্যার যোগ্যতা পরীক্ষাকালে ইচ্ছাকৃত ভাবে বারবার অনুপস্থিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ ঐ বিষয়ে অনুত্তীর্ণ থেকে যান, ফলে বিলাতে ইংরেজ সরকার শ্রীঅরবিন্দকে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তি ব্যাপারে বিরত থাকেন। শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তীকালে তিনি যে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিচালক হয়েছিলেন এই ঘটনায় তারই প্রথম আভাস লক্ষ্য করা যায়। শৈশবে ইউরোপীয় আবাওয়ায় মানুষ হলেও শ্রীঅরবিন্দের মনে গভীর স্বদেশ প্রীতি যে কিভাবে জাগ্রত হল তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অনেকের ধারণা শ্রীঅরবিন্দের পিতা দেশথেকে জনপ্রিয় দেশকর্মী সুরেন ব্যানার্জীর ইংরেজী সংবাদপত্র 'বেঙ্গলীতে' ইংরেজের অপশাসন, বিশেষত ভারতীয়দের ওপর ইংরেজদের অন্যায়-অত্যাচারের যেসব ঘটনা ও মন্তব্য প্রকাশিত হত, তার 'কাটিং' ছেলের কাছে পাঠাতেন, সেগুলি পড়েই তাঁর মনে স্বদেশপ্রীতির সৃষ্টি হয়। তাছাড়াও শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসু ছিলেন জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ ও দার্শনিক। সুতরাং, পিতা ও মাতামহের প্রভাব যে তাঁর স্বদেশপ্রীতির অন্যতম কারণ, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

১৮৯৩ সনে ইংলণ্ড থেকে দেশে ফেরার আগেই শ্রীঅরবিন্দ ভারতের স্বাধীনতা ও বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ভারতে এসে প্রায় বারবছর তিনি বরোদায় অতিবাহিত করেন। বরোদায় রাজ দপ্তরে কিছুদিন কাজ করার পর শ্রীঅরবিন্দ বরোদা কলেজে ফরাসী ভাষায় অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। পরে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং সবশেষে সহকারী অধ্যক্ষের পদও গ্রহণ করেন। কিন্তু অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকলেও তিনি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গের কথা কখনই ভুলে যান নি।

১৮৯৩-৯৪ সনে শ্রীঅরবিন্দ বোম্বে শহর থেকে প্রকাশিত 'ইন্দু প্রকাশ' নামে এক ইংরেজি সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এইসব প্রবন্ধে তাঁর গভীর স্বদেশ-প্রেম, তেজোদীপ্ত জ্ঞান ও প্রখর আন্তরাগ্নির বহ্নি-স্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। কিভাবে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা যায়। কিভাবে দেশের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করা সম্ভব—এই ছিল তখন শ্রীঅরবিন্দের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। ১৯০৫ সনে বঙ্গদেশকে দু'ভাগ করে দুটি প্রদেশে পরিণত করার প্রস্তাবে বাংলাদেশে এক বিরাটকায় আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং বঙ্গভঙ্গ রোহিত করার এই আন্দোলন ক্রমে স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে। ঠিক এই সময়েই বরোদার কাজ ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরের জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'আবির্ভাব' অধ্যায়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তি-পরিচয়, শিক্ষা-দীক্ষা ও বরোদায় চাকরী এবং বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু বর্ণনা এত সংক্ষিপ্ত যে শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বনিয়াদ সম্পর্কে পাঠকগণের সুস্পষ্ট পরিচয় সাধন সম্ভব হয় না। এই অধ্যায়টির বিস্তৃতির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা পাঠক সমাজে অবশ্যই অনুভূত হবে।

স্বদেশী, বয়কট প্রভৃতি প্রচার-কার্যে শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়িয়ে বক্তৃতা করেন। এই সময়ে বিশিষ্ট বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সহকারীরূপে যোগ দেন। কয়েকমাস পরে বিপিনচন্দ্র এই পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করলে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই পত্রিকা-সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১৯০৬ সনে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নতুন কার্যসূচী প্রকাশ করেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যেসব প্রবন্ধ লেখেন তা সারা ভারতবর্ষে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি তখন পুরোপুরি সময় সাংবাদিকতা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ নীতির স্বরূপ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী যে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয় তার মূলসূত্রগুলির প্রথম প্রবক্তা কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর অগ্নিস্রাবী লেখনীর প্রতিটি ছত্র দেশবাসীর নিস্তরঙ্গ জীবনে জলোচ্ছ্বাসের উন্মাদনা সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদের নতুন বীজবপন করলেন তিনি দেশবাসীর মনে। শ্রীঅরবিন্দের কথায়—'স্বদেশকে মা বলিয়া জান, ভক্তি কর, পূজা কর। মাকে উদ্ধার করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে।' 'নৈষ্কম্য এবং লোকসংগ্রহ' অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের লোকশিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসীর চেতনায় বিপ্লব সৃষ্টির যে প্রয়াস তা সুষ্ঠুভাবে বিবৃত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের পরোক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী দলের শক্তি ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ দিন দিন বৃদ্ধি পায়। বিপ্লবী দলের প্রধান কেন্দ্র মানিকতলার মুরারিপুকুর বাগান। এটাই ছিল তখনকার বোমা তৈরীর কারখানা। ১৯০৮ সনের ১লা ও ২রা মে ঐ বাগান পুলিস ঘেরাও করে এবং অনেক বিপ্লবী পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। শ্রীঅরবিন্দকেও তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আলিপুরের জেলে তিনি এক বছর ছিলেন। আলিপুর জেলে অবস্থান ও আলিপুরের বোমার মামলাই শ্রীঅরবিন্দের দ্বৈত জীবনের সন্ধিস্থল বলা যায়। এই সময় থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার হয় সূত্রপাত। শ্রীঅরবিন্দ জেল অর্থাৎ কারাগারকে 'যোগাশ্রম' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর কথায় —'সেই আশ্রম ইংরেজ কারাগার। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম।' "যোগাশ্রমের একটি বছর" অধ্যায়টি 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বৃহৎ এই কারণে যে, এই অধ্যায়ে যে সমস্ত ঘটনার ভিত্তিতে শ্রীঅরবিন্দকে আলিপুর বোমা মামলার সঙ্গে জড়ানো হয়েছিল, সেগুলির সম্ভাব্য বিবরণ নেওয়া হয়েছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের যুগান্তকারী সওয়াল প্রভাবের ভিত্তিতে শ্রীঅরবিন্দের নির্দোষিতা প্রমাণের বিশ্ব তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটির মূল প্রসঙ্গ যখন নিছক আইন-সংক্রান্ত নয়। তখন এইসব বিতর্ক-জটিল আইন সম্মত তথ্যে গ্রন্থটি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। লেখকদ্বয় দীর্ঘ ও বিস্তৃত তথ্যের যদি একটি সংক্ষিপ্ত সার-সংকলন করে দিতেন, তাহলেই গ্রন্থটির ভারসাম্য বজায় থাকতো। রচনাগত মাত্রাজ্ঞানের অভাবেই এই অধ্যায়টি অপেক্ষাকৃত একঘেয়ে ও অনাকর্ষণীয়।

১৯০৯ সনে আলিপুর জেল থেকে অব্যাহতি পাবার পর শ্রীঅরবিন্দ কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজি সাপ্তাহিক। 'কর্মযোগিন' এবং পরে বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' নামক পত্রিকা প্রকাশে মনোনিবেশ করেন।

'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় 'আমার দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি' (An open letter to my Countrymen) নামক নিবন্ধে জাতীয় আন্দোলনের ভাবী পদক্ষেপ সম্পর্কে ও মিণ্টো-মর্লি শাসন-সংস্কারে দেশের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশি ঘটবে, এই মন্তব্য করে দেশবাসীকে সচেতন করার এক জরুরী আহ্বান জানান শ্রীঅরবিন্দ। এই 'খোলা চিঠি'র জন্য সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনেন। কিন্তু তার আগেই তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন। চন্দননগরে কিছুদিন থাকার পর শ্রীঅরবিন্দ গোপনে পণ্ডিচেরী রওনা হন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল। 'প্রাক্-পণ্ডিচেরী বৃত্তান্ত' অধ্যায়টি শ্রীঅরবিন্দের 'আমার দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি'র উল্লেখযোগ্য অংশগুলির উদ্ধৃতি সংকলন করে আরো সমৃদ্ধ করা যেতে পারতো।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার তপোবন পণ্ডিচেরী। এখানেই তিনি ভাগবত্ ধর্মের প্রবক্তা ও পথিকৃৎ হিসাবে যথার্থভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯১৪ সনের ১৫ই আগষ্ট 'আর্য' মাসিক পত্রিকা শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে বেদ-রহস্য, উপনিষদের ব্যাখ্যা, দিব্যজীবনের আদর্শ, যোগ-সমন্বয়ের প্রণালী, ভারত-সংস্কৃতির পরিচয়, মানবের মহামিলনের আদর্শ, মানব সমাজের বিবর্তনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ দিব্যজ্ঞানপ্রসূত আলোচনা প্রকাশ করেন। 'পণ্ডিচেরীতে উত্তরযোগী শ্রীঅরবিন্দ' অধ্যায়ে যোগীশ্বর শ্রীঅরবিন্দের তৎকালীন চিন্তাধারার সম্যক্ পরিচয় প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন লেখকদ্বয়। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করার মত। লেখকদ্বয় এই স্বাতন্ত্র্যকে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন :—মানুষের অন্তঃস্থ ভগবানকে বিস্মৃত হয়ে রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। রাজনীতিকে আশ্রয় করে ব্যক্তিপূজা তাঁর মতে স্বধর্মের বিকৃতি। মানুষ একমাত্র ভগবানের শ্রীচরণে বশ্যতা স্বীকার করবে—এই সত্যকে উপেক্ষা করে কোন নেতার মতবাদ বা কোন রাজনীতি ভারতের সনাতন ধর্মের পরিপন্থী। মানুষের অন্তঃস্থ ভগবানকে উপেক্ষা করে যদি মানুষের উপর জোর করে কোন মতবাদ চাপানো হয় তাহলে মানুষের মধ্যে স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতার চেতনা বিকশিত হবার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। সংকীর্ণ রাজনীতিতে, দিব্য-প্রকৃতির আধার মানুষকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্রে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা মানুষকে বন্দীজীবনের আস্বাদ দেয় —মুক্তির দিব্য আস্বাদে বঞ্চিত হয়ে মানুষ অধোগতির পথে মুক্ত জীবনের পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্তে সমাজকে দূষিত করে তোলে।'

১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবন সাধন পথের মহান্ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হয়। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার উর্ধ্বগতি সম্পর্কে তাঁর নিজেরই উক্তি : 'যত উচুতে উঠি, মানুষের Spiritual evolution-এর (আধ্যাত্মিক বিকাশের) চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়। অথও অনন্ত আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয়, শুধু ত্রিকালাতীত পর ব্রহ্মে নয়—দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হয়ে জীবনে মূর্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগপহার central clue (মূলকথা)।' 'বিজ্ঞানময় পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ' অধ্যায়ে জীবদ্দশায় মানুষের পক্ষে ব্রহ্মবিজ্ঞানী হয়ে অমৃতত্ব লাভ করা যে সম্ভব শ্রীঅরবিন্দই তার প্রমাণ—তাঁর "বিজ্ঞান-সিদ্ধি"র সাফল্যের কথাই সূক্ষ্মরভাবে বিবৃত হয়েছে।

'জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দের "প্রারব্ধ" কর্মজীবন' অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের জগৎব্যাপী বৃহৎ কর্মযজ্ঞের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববাসীর কল্যাণ এবং মুক্তির ব্রতে ব্রতী পুরুষদের সংঘকেন্দ্র পণ্ডিচেরী থেকে আধ্যাত্মশক্তির অদৃশ্য রশ্মির আকর্ষণে দিব্যজীবনের জিজ্ঞাসা নিয়ে সর্বস্তরের মানুষ সমবেত হয়েছেন শ্রীঅরবিন্দের পাদপীঠে। প্রজ্ঞাসুন্দর শ্রীঅরবিন্দের শ্রীহস্তপ্রসূত বেদান্তভাষ্য 'দিব্যজীবন' ভারতের আধ্যাত্মিক মহিমাকে সমুজ্জ্বল করে সবার দৃষ্টি ভারতের দিকে আকৃষ্ট করেছে। অতিমানসের আলোকের কর্মাধারায় স্নাত মহাকাব্য 'সাবিত্রী' শ্রীঅরবিন্দের এক মহান্ কীর্তি। সাধারণ মানুষ দিব্যদৃষ্টির অভাবে যে অনন্ত জিজ্ঞাসা বুকে নিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধরে এগিয়ে চলে, তার অভ্রান্ত উত্তর রয়েছে এই রচনায়। ১৯৫০ সনের ৫ই ডিসেম্বর নশ্বর দেহ ত্যাগের আগেই শ্রীঅরবিন্দ মানব মনের মহাকাব্য রচনা শেষ করেন। 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছত্রের উদ্ধৃতি সহযোগে এই অধ্যায়টি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়েছে।

'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' নামক অধ্যায়টি গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। এই শিরোনামেই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের স্ব ইচ্ছায় তাঁর নশ্বর দেহের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এ সম্পর্কে তাঁর দিব্যবাণী শ্রীমা শুনেছিলেন—'I have left this body purposely. I will not take it back. I shall manifest again in the first supramental body built in the supramental way'. 'ব্রহ্মসূত্রে' মনস্পতি পুরুষের এই ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ যে যথার্থই মনস্পতি এবং দিব্যজীবনের দিশারী তার পরিচয়ে এই অধ্যায়টি সমুজ্জ্বল।

কিছু ত্রুটি থাকলেও আটটি অধ্যায় সংবলিত 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' ১৯৭৩ সনের বাংলা গ্রন্থজগতের একটি মূল্যবান্ সম্পদ। দিব্য জ্যোতি স্নাত শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও তাঁর দর্শনের এরূপ মনোজ্ঞ আলোচনার জন্য শ্রীসুকুমার বসু ও শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত শ্রীঅরবিন্দ-অনুরাগী পাঠক সমাজের কাছে যে কৃতজ্ঞভাজন হবেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর এবং গ্রন্থমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের কয়েকটি আলোকচিত্র থাকায় 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থটির আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধীর দে

O F-I-68

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা রিপ্লাই কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না—সমকালীন 'প্রবন্ধের পত্রিকা'। লেখার মধ্যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবেন না। ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা হরফে লিখে দেবেন।

'সমকালীন'-এর গ্রন্থ-পরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা 'শিল্প', 'দর্শন', 'সমাজ-বিজ্ঞান' ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন :২৩-৫১৫৫